পুরাণ-রহস্য ।

অর্থাৎ

বিদ্যাসুন্দর, মহাভারতীর কথার ছলনা, বশিষ্ঠ-বীর্য,
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বিরাট-বধন প্রভৃতি বিষয়ক
নূতন [illegible] ।



শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।

সিক্‌রার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত ।

[illegible]

RINTED BY NILMONY DHUR, AT THE
HINDU PRESS,
61, Aheeritollah Street, Calcutta.

প্রকাশকের মন্তব্য।

কোন নূতন প্রকারের গ্রন্থ প্রচার দ্বারা ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করা, আমাদিগের সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগারের উদ্দেশ্য বলিয়া আমরা বর্ত্তমান পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে উদ্যোগী হইলাম। আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিতগণ এখন অনেকে তাঁহাদিগের কল্পনা-কণ্ডূয়ন নিবারণোপযোগী প্রবন্ধ পাঠ করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এ পুস্তক তাঁহাদিগকে যেমন পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে, সরলহৃদয় হিন্দুপাঠকও তেমনই গ্রন্থকারের কল্পনা-প্রিয়তা বা ভাবুকতাতে আমোদ পাইবেন। ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩০২ সাল।

সিক্‌দার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার। } শ্রীবাণীনাথ নন্দী, কার্য্যাধ্যক্ষ।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

বিদ্যাসুন্দর। *

"মনে যা' ভাব তা' নয়।"

হেঁয়ালী।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর যে একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, একজন পবিত্র লোক ছিলেন, এরূপ পরিচয়ও পাওয়া গিয়া থাকে। তাঁহার পবিত্রতার পরিচায়ক প্রসঙ্গ আমাদের এক্ষণে বর্ণনীয় নহে। তাঁহার যে কয়েকখানি জীবনবৃত্তান্ত আমরা পাঠ করিয়াছি, সে সকল গুলিই এক-বাক্যে তাঁহার পবিত্রভাব স্বীকার করিয়াছে। এরূপ পবিত্র-চেতা পণ্ডিতের লিখিত পুস্তক "বিদ্যাসুন্দর" আধুনিক বিদ্যানুরাগী ও বিদ্বৎ-পদবাচ্য নব্য যুবকদিগের নিকট কেন অপাঠ্য বলিয়া ঘৃণিত হয়, তাহা আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। "বিদ্যাসুন্দর" সম্বন্ধে আমাদের যে সকল কথা মনে হয়, তাহা এই সকল শিক্ষিত যুবকবৃন্দের নিকট জানাইয়া একটা মীমাংসা করিয়া লইতে অনেকদিন অবধি ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু পাছে এ সকল কথা ভুলিতে গেলে

---

* এই প্রবন্ধটী যদিও পৌরাণিক কথা অবলম্বনে লি- কিন্তু পৌরাণিক কথার তাৎপর্য্য কিরূপে ধরা যাইবে, ত- সুবিধার জন্য এটী দেওয়া হইল।

কাহারও নিকট কোন প্রকারে অপরাধী হইয়া পড়ি, সেই ভয়ে একটু কুণ্ঠিত হই। কিন্তু কবিবর জয়দেব সম্বন্ধে যে সমালোচনা আজিকালি দেখিতেছি, তাহা দেখিয়া মনে হয় সত্যের অন্বেষণ করিতে গিয়া কাহারও মনে পাছে ব্যথা দিয়া ফেলি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ভয় করিবার আবশ্যক নাই। জয়দেব সমালোচক মহোদয়গণ যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আধ্যাত্মিকভাব ত্যাগ করিয়া তাহার উলঙ্গভাবের উপর সমালোচনা করিয়াছেন, আমরা তদ্বিপরীতে কবিবর ভারতচন্দ্রকে পবিত্রচেতা পণ্ডিত জানিয়া বিদ্যাসুন্দরের ভাবান্তর গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাহাই এস্থলে বিবৃত করিতে উৎসুক হইয়াছি।

বিদ্যাসুন্দরের গল্পটী বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং এস্থলে তাহার আর পুনরাবৃত্তির আবশ্যকতা নাই। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে ভক্ত কবিগণ ভগবানের লীলা সামান্য স্ত্রীপুরুষের লীলার ন্যায় অনেকস্থলে বর্ণন করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরেও সেইরূপে ভগবানের লীলা বর্ণিত হইযাছে। দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন-প্রকৃতি ভক্তের ভাব লইয়া পত্নী বা উপপত্নী, সখী বা সখা, মাতা বা পিতা ইত্যাদি নানাপ্রকার রূপক বর্ণিত হয়। আর ভগবানের ভাব লইয়া কখন "চিকণ কালা" কখন "দেব" কখন "দেবী" ইত্যাদির বর্ণনা হইয়া থাকে। শিক্ষাভেদই ভক্তের এবং ভগবৎ-চিন্তাভেদের অন্যতর কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই দেশ কাল পাত্রভেদে ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি যে সকল ভক্ত একেবারে ভাব, ...া অলঙ্কার ত্যাগ করেন, তাঁহারা কেবল প্রকৃতি ও Matter ও Motion এর লীলা লইয়া উন্মত্ত হয়েন; ...ই বর্ণন করেন। ভারতীয় মহাত্মাগণের মধ্যে

অনেকেই রসতত্বজ্ঞ; এইজন্য তাঁহারা প্রায় সকল বিষয়েই অলঙ্কার দিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিদ্যাদর্পে দর্পিত সরলযুবক-ভক্তের ভাব লইয়া শ্রীমতী বিদ্যা গঠিত হইযাছেন। গ্রন্থকার যেন সেইজন্যই তাঁহাকে বিদ্যানামে অভিহিত করিযাছেন। শ্রীমতী বিদ্যা বিদ্যাদর্পে দর্পিতা হইবা প্রতিজ্ঞা কবিলেন, "বিচারে জিনিবে যেই, পতি হ'বে সেই, সেই সে তাহার।"—স্বামী, কর্ত্তা, বা পুরুষভাবে আব তিনি যাহাকে-তাহাকে লইতে রাজি নহেন। চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে পিত্রাদিব অনুজ্ঞাত স্বামী তিনি চাহেন না। কাজেই পুত্তলিকাবৎ একজনকে তিনি স্বামী বা ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কবেন নাই। তখন বিনা সুতায় হারের স্রষ্টা, "গুণসিন্ধু" রাজপুত্র, "কাঞ্চীপুরের" "সুন্দর পুরুষেব" টনক নড়িয়াছিল। তিনি 'মনোরথ' অশ্বে আরোহণ করিয়া 'পাঁচখানি অস্ত্র' গ্রহণপূর্ব্বক উন্নতিশীল সর্ব্বজাতির আবাসভূমি বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। "সুকবি সুন্দর" পুরুষ একেবারে প্রকাশ্য রাজসভায় গমন পূর্ব্বক শ্রীমতী বিদ্যাকে দর্শন দেন নাই। ভক্তপ্রধান ধ্রুবও যখন ডাকের চোটে ভগবানকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখনও তিনি প্রথমে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দর্শন দিতে পারেন নাই। তখন গুরুরূপ মধ্যস্থের আবশ্যক হইয়াছিল। এস্থলে বিদ্যার শিক্ষা ভেদে সেই কার্য্যের ভার মালিনীর হস্তে পতিত হইয়াছিল। মালিনী হাত মুখ নাড়িয়া নাগর-নাগরীর মন ভুলাইতে বেশ মজবুত; প্রচার-প্রবৃত্তি-প্রিয় ভক্তগণও হাত মুখ নাড়িয়া উত্তর সাধকগণের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মালিনী বিদ্যাবতী শ্রীমতী বিদ্যাকে প্রথমে শ্রীসুন্দর নির্ম্মিত বিনা-সুতার হার দেখাইলেন। বিদ্যার হৃদয়ে তাহাতেই প্রেমের অঙ্কুর হইল। তিনি সৃষ্ট পদার্থ দেখিয়া স্রষ্টার জন্য ব্যাকুল হইলেন, এবং মালিনীকে বলিলেন, "গড়িল যে জন, সে জন কেমন, বিশেষ কহনা ছলে।" তিনি তাহাতে স্রষ্টার অদ্ভুত লিখিত নাম স্পষ্ট পাঠ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। পাঠক! বলুন দেখি, যদি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি নভোমণ্ডলে তারার মালা দেখিয়া, তাহার স্রষ্টাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন, এবং নিকটস্থ আচার্য্যকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আপনারা তাহাকে প্রকৃত ঈশ্বর—কর্ত্তা—স্রষ্টার প্রেমে প্রেমিক বলেন কি না? এই অঙ্কুরিত প্রণয়ের সঙ্গে রক্ত মাংসের সংস্রব নাই। সুন্দর যখন মাল্যরচনা করিতেছেন, তখন "মলয় পবন গুণ যোগায়" ইত্যাদি ইত্যাদি পাঠ করিয়া, আমরা সুন্দরকে একটা বাজে কারিকর বা মালী বলিয়া মনে করিতে পারি নাই।

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অনেকে বলিতে পারেন, ওগুলা বর্ত্তমান লেখকের গাজুরির কথা, কতকটা মিল আছে বলিয়া মিলাইয়া দিয়াছে। এবার শুনুন—ভারতচন্দ্র স্বয়ং কি বলিতেছেন। বিদ্যাসুন্দরের মিলনের ঠিক পূর্ব্বেই তিনি ধুয়া ধরিয়াছেন;—

"কলিমল মথনং, হরিগুণ কথনং,
বিরচয় ভারত কবিবর ভুগুে॥"

একথাটা কি? হয় ত কেহ বসাইয়া দিয়াছে! যদি তাহাই হয়, তবে আর একটু পাঠ করা যাউক। বিদ্যার এখন অভিমুখ গতি হইয়াছে। সেই বিনা সুতার

হ্যরের স্রষ্টাকে দেখিবেন বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। কবিবর কাজেই বিরহ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তা'ই বলিয়া তখন পতিলাভে কাতরা বিদ্যা আপনাকে আপনি 'বিরহিনী' বলেন নাই; বরং তাঁহার বেশভূষা সমস্ত 'কাল' বলিয়া বোধ হইল। আর ভাবিল, "কেমনে জীবে পাপিনী" অর্থাৎ অভিমুখ গতি হওয়ায় আপনাকে আপনি পাপিনী মনে করিতেছেন। তৎপরে হঠাৎ শ্রীসুন্দরকে বিদ্যার আপন কক্ষমধ্যে দেখা উপলক্ষে কবিবর পুনরায় ধুয়া ধরিলেন;—

"একি দেখি অপরূপ, দেখ্‌লো সই,
ভুবনমোহন রূপ।
কোন্ পথ দিয়া, কেমন করিয়া,
আইল নাগর ভূপ॥
এ জন যেমন, না দেখি এমন,
মদনমোহন কূপ॥ (রূপ ?)
থাকে সব ঠাঁই, কেহ দেখে নাই,
বেদেতে কহে অনুপ।
ভারতের নিধি, মিলাইল বিধি,
না কহিও চুপ চুপ॥"

এখনও কি সন্দেহ রহিল—বিদ্যাসুন্দরের এ ভাব কি বাজে কথা ? তবে পাঠক মহাশয়! আর একটু অগ্রসর হউন কিন্তু এইবার যে স্থানটী সাধারণে অশ্লীল বলিয়া থাকেন সেইস্থান আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবেরা বলেন, 'রাসলীলা' 'মিলন' প্রভৃতি বিষয় উচ্চ অঙ্গের ভক্ত ব্যতীত যে-সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না; এবং যাহাকে-তাহাকে বুঝান বা বুঝাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়। এইজন্য ও সকল ব্যাপারের কথা হাটে, মাঠে, বাজারে পাওয়া যায় না। অধিকারী-ভেদ

সকল সম্প্রদায়েরই আছে; তবে হিন্দুর অধিকারী-ভেদের নিয়ম কিছু বিশেষ—হিন্দু সরলভাবে তাহা স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করেন। তা'ই বৈষ্ণবেরা উক্ত বিষয়ের কথা যেখানে সেখানে বলেন না; এবং এইজন্যই বোধ হয় গ্রন্থকার "চুপি চুপি" বলিয়াছেন। তা'ই, 'বিরহাদি' বিষয় ত্যাগ করিয়া আরও অগ্রে চলিলাম।

তৎপরে সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদর্শন। তখন গ্রন্থকার বলিতেছেন, সে রসিয়া-নাগর কত রূপই ধরেন!

"বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণ সাগর হে॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী,
কখন গৃহস্থ, কখন ভিখারী,
অবধূত জটা-ধরহে।
কখন ঘেটেল, কখন কাঁড়ারী,
কখন খেটেল, কখন ভাঁড়ারী,
কখন লুটেরা, কখন পসারী,
কভু চোর কভু চর হে॥" ইত্যাদি ইত্যাদি।

"এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোনজনা॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোর চূড়ামণি॥"

সর্ব্বপ্রকার রূপ এক বিশ্বনিয়ন্তা ব্যতিরেকে আর কাহাতে সম্ভবে? এইস্থানটী পাঠ করিতে করিতে ভক্তকবি চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য" (অক্ষয় বাবুর সংস্করণ) মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ কখন বেদিয়া, কখন নাপিতিনী,

কখন দোকানী ইত্যাদি নানা সাজে শ্রীরাধিকার সহিত রহস্য করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ! শ্রীসুন্দরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করিতেছি বলিয়া, কেহ যেন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনাদের মধ্যে কেহ শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু, কেহ পুত্র, কেহ সখা, কেহ পতি, কেহ বা উপপতি ইত্যাদি রূপে দেখিয়া থাকেন; অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসের মধ্যে অধিকারী বিশেষে যে কোন রসে 'ঢালি তনু মন' তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন। কেহ বা 'শ্যাম' নাম শুনিয়া মজেন, কেহ বা কখন বা চিত্রদর্শনে মজেন,—তেমনি কেহ যদি সৃষ্ট পদার্থ দেখিয়া স্রষ্টার জন্য মজেন, তাহাতে ক্ষতি কি? সেইরূপ কোন ভক্ত যদি বলেন,—

"কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি॥"

তাহাতে কি তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি প্রেমের পরিচয় হইল না?

বিদ্যাসুন্দর লীলার আসরে এইবার আর দুইখানি চিত্র দেখা দিল—রাজা ও রাণী। সমগ্র পুস্তকখানি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ইহার পাঁচখানি চিত্রই প্রধান—বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী, রাণী ও রাজা। তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি চরিত্র যে ভাব লইয়া গঠিত, তাহা উল্লেখ করিয়াছি। যথা— বিদ্যা বিজাতীয় ভাবে শিক্ষিত যুবকের, সুন্দর স্রষ্টার, এবং মালিনী প্রচারকের, ভাব লইয়া গঠিত। এইবার রাণী, তৎপরে রাজা। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে গ্রন্থকার সমাজের ছায়া লইয়া রাণীর, এবং সমাজপতির (সমাজ যাহাদিগের দ্বারা চালিত হয়, তাহাদিগের) ছায়া লইয়া রাজার, চরিত্র গঠিত করিয়াছেন।

"বিচারে জিনিবে যেই, পতি হ'বে সেই,
সেই সে তাহার।"

'এ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সমাজরূপিণী রাণী কি ভাবিতেছেন, তাহা গ্রন্থকারের ভাষায় বলা যাউক ;—

"আমি জানি ধন্যা, বিদ্যা মোর কন্যা,
ধন্য ধন্য সর্ব্বঠাঁই।"

প্রথমে শিক্ষিত যুবকের দল দেখিয়া, সমাজেরও মনে উক্ত ভাবের উদয় হয়। কিন্তু বিজাতীয় ভাবে শিক্ষিত যুবকের উদর স্ফীত হইয়াছে, দেখিয়া সমাজ এইবারে মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন। ঘোর তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তখন স্রষ্টার প্রেমে উন্মত্তা শ্রীমতী বিদ্যা বলিলেন ;—

সবে এক জানি, শুন ঠাকুরাণি,
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর, দেব কি কিন্নর,
বলে করে আলিঙ্গন॥
চোর বলি তারে, চাহি ধরিবারে,
তপাসি ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রাভঙ্গে চাই, দেখিতে না পাই,
নিত্য এই জ্বালা মোরে॥"

শ্রীসুন্দরের এরূপ পরিচয়ে সমাজরূপী রাণীর অসন্তোষ কমিল না, কাজেই তিনি পতির নিকটে গেলেন। রাজাই প্রকৃতপক্ষে সমাজপতি; কাজেই রাণী তাঁহার উপরে রাগ অভিমান জানাইলেন। রাজা বা সমাজপতি "পলিটিক্স" (রাজনীতি) লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার অন্য কিছু দেখিবার বড় সময়ের অপ্রতুল। তবে কেহ আসিয়া জানাইলে ক্ষমতানুসারে সে জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি,—সুন্দর কে, বা তাহাকে কিরূপ ভাবিতে হইবে, তাহা দেখাইবার জন্ম গ্রন্থকার গ্রন্থের নানাস্থলে যেরূপ ধুয়া দিয়াছেন, অন্যের পরিচয়ের জন্য সেরূপ দেন নাই। এইজন্য আমাদের বাক্য-প্রতিপাদক গ্রন্থকারের স্পষ্ট বচন উদ্ধৃত করা কঠিন। তবে গ্রন্থের প্রথম হইতে সাবধানে পাঠ করিয়া গেলে, আর কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার আবশ্যক থাকে না—আভাসে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমতী বিদ্যা শ্রীসুন্দরকে যেরূপ পাইয়াছিলেন, শ্রীমতী মালিনী তেমন পান নাই। তবে তিনি প্রথমে শ্রীসুন্দরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপর একটা টানও জন্মিয়াছিল। শ্রীসুন্দরের ভিতরের ও বাহিরের সৌন্দর্য্য শ্রীমতী বিদ্যাই বুঝিয়াছিলেন। আর সকলে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়াছিল।

এ জগতে আর একদল লোক আছে, তাহারা সমাজ-পতির আদেশমত মহা ধূমধাম করিয়া "চোর চূড়ামণি" ভগবান্‌কে ধরিতে চায়। আমাদের সমালোচ্য বিদ্যাসুন্দরে সমাজপতি রাজার অধীনস্থ "ধূমকেতু" তাহারই প্রতিরূপ। তাহারা ব্রজনারীর ন্যায় নারীবেশে চোর চূড়ামণিকে ধরিয়াছিল। চোর ধরায় গ্রন্থকার ধুয়া ধরিয়াছেন ;—

"আজি ধরা গেল চোর চূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী॥
ভাঙ্গা গেল যত ভূর, চাতুরী হইল চুর,
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভূরি, অনেক করেছ চুরি,
আজি ধরি শিখাব তেমনি॥

হৃদি কারাগারে ঘোরে, বান্ধিয়া মনের ডোরে,
গছাইব পরাণে এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ, ধরিতে না পারে কেহ,
ভারত না ছাড়িবে অমনি ॥

কোটালাদি কর্ম্মচারীগণ অল্পবিদ্যা-সম্পন্ন; তাহারা তাঁহাকে সাকার ধরিতে চায়। তাহারা তাঁহাকে সাকার ভাবিয়াছিল—সাকার দেখিয়াছিল। সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, তাঁহাকে যে যেভাবে ভাবে, সে সেইভাবে দেখিতে পায়। এ স্থলে তাহারা তাঁহাকে সাকার ভাবে, কাজেই সাকার দেখে। নিরাকারবাদী স্রষ্টা-পূজক শিক্ষিত যুবক তাঁহাকে "স্বপনে" দেখেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহাও সাকার—তাই তাঁহাদের গানে শুনিতে পাই—"স্থান দিও চরণতলে" ইত্যাদি।

ক্রমে যখন সমাজপতি সুন্দরকে দেখিলেন,—তাঁহার রূপে মন বিচলিত হইল—পরিচয়ে আপনার বলিয়া বুঝিলেন, তখন সকল গোল মিটিয়া গেল। সুন্দর জামাই হইলেন, আপনার বলিয়া গৃহীত হইলেন। পরিচয়ের পূর্ব্বে একদিন রাজা সুন্দরকে মশানে লইয়া গিয়া কাটিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সে জন্য শ্রীসুন্দর বা তাঁহার ভক্ত বিদ্যা (সমাজপতি) রাজার উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন নাই। প্রকৃত ভক্তের হৃদয়ে বিদ্বেষভাব থাকে না। তা'ই বলি, যে সকল শিক্ষিত যুবক ভগবানের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, এরূপ ভাব দেখান অথচ সমাজপতির নির্যাতন ভাবিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হন, তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত নহেন।

অনেকে বলিতে পারেন, বর্ত্তমান লেখক সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বিদ্যাসুন্দরের এরূপভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে সময়ে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল,

তখন যে কতক পরিমাণে সমাজের এইরূপই অবস্থা ছিল না, একথা মনে হয় না। সকল দেশে সকল সময়েই শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ঈশ্বর-প্রেমিক, সংসারে মত্ত, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন অধিকারের লোক থাকে। নিতান্ত বর্ব্বরদিগের মধ্যেও সামাজিক নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। কোন দেশে পূর্ব্বকালে হয়ত কোন কোন বিষয় এখনকার মত এতটা ছিল না, হয়ত কোন কোন বিষয় আবার এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল; এইরূপ মাত্রা ভেদমাত্র। এসব জিনিস চিরকালই একধরণের। এই জন্যই ৺ শঙ্করাচার্য্যের "মোহমুদ্গর" যখন প্রস্তুত হয়, তখনও যেমন লোকের অবস্থার উপযুক্ত, এখনও সেইরূপ উপযুক্ত। কোন শাস্ত্র গ্রন্থই এই জন্য পুরাতন বা বাজিল হয় না। আরও এক-দিক হইতে দেখ,—কবি, ভাবুক, রসিক বা প্রেমিক, এই জড় জগতের অধিবাসী হইলেও, তিনি ঐ জগতের অন্যান্য জীবের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে জড় ভাবাপন্ন নহেন। অন্যান্য জীব যতই কেন উন্নত হউক না—তাঁহার ক্ষমতা দেশ কাল পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিবে; কিন্তু প্রকৃত কবির দৃষ্টি শক্তি তদ্রূপ সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিলে ভূত ও ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের ন্যায় তাঁহার নয়নপথের গোচর হয়। সেক্সপীয়র, মিল্টন, বাল্মীকি, বেদব্যাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থের প্রকৃত পাঠকেরা কবির এই মহান্‌শক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না, এইজন্যই বোধ হয় কথা আছে :—

"রাম না হইতে ষাটিহাজার বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥"

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল দেখিয়া, ক্রমেই আরও সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে। শ্রীসুন্দরের কালী স্মরণ, শ্রীরাম-

চন্দ্রের ভগবতী স্মরণের সঙ্গে অথবা খৃষ্টের পিতৃস্মরণের সঙ্গে মিলাইয়া লইলেই চলিবে। তৎপরে শ্রীসুন্দরের স্পর্শে রাজা বীরসিংহের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি শ্মশানক্ষেত্রে অনন্ত-রূপিনী কালীর দর্শনলাভ করিলেন। মহাশক্তির মহিমা প্রকাশ হইল, আর পরম পুরুষ সুন্দর প্রকটমূর্ত্তিতে "বর্দ্ধমানে" তিষ্ঠিতে সম্মত নহেন। কাজেই শ্রীমতী বিদ্যাকেও সঙ্গে লইয়া "কাঞ্চীপুর" গমন করিলেন।

দীর্ঘতার ভয়ে প্রায় সকল কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। আশা করি, সুবোধ বিদ্যাসুন্দরবিদ্বেষী পাঠক মহোদয়গণ বিষয় বিচার করিয়া একটা সুমীমাংসা করিয়া লইতে পারিবেন।



মহাভারতীয় কথার সূচনা।



আর্য্যঋষিগণ যে কিরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহা একদিক হইতে দেখিলে, কিছু বুঝিতে পারা যায় না। তবে সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তায় থাকিয়া যেন কতকটা ব্রহ্মত্ব পাইয়াছিলেন। তাঁহারা অসীম জ্ঞান ও ভক্তিযোগে যে কর্ম্মের উৎপাদন করিয়াছিলেন,—সুমেরু-সম ধর্ম্মের যে উচ্চ-শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান-সম্পন্ন না হইলে, আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব? তবে ক্রমাগত তাঁহাদের পদাঙ্ক ধরিয়া চলিলে যে তাঁহাদের জ্ঞানাগ্নির উত্তাপেও আমরা কতকটা উত্তাপিত হইতে পারি, তাহা সামান্য জড়ের উত্তাপের নিয়ম দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে।

যেমন এক দেহে নানা রোগ থাকিলেও সুবিজ্ঞ বৈদ্য বায়ু, পিত্ত, কফের প্রভাব বুঝিয়া রোগের মূল নির্ণয়, এবং তদনুসারে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তদ্রূপ সমাজ মধ্যে নানা-প্রকৃতির লোক থাকিলেও আর্য্যঋষিগণ (নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে সম্ভূত) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিনটী গুণের প্রভাব বুঝিয়া চরিত্রের দোষ গুণ নির্ণয় ও তদনুসারে ব্যবস্থা দান করিতে পারিতেন। *

---

* "নির্ব্বিকার পরমাত্মা সম্ভূত গুণেন্দ্রিয়ৈঃ।
চেষ্টতে কারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ ॥

গুণত্রয়ের প্রভাব বুঝিয়া আর্য্যঋষিগণ পুরাণাদিতে যে সকল চরিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, যতদিন গুণত্রয়ের লীলা থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের প্রদর্শিত সেই সকল চরিত্র সজীব থাকিবে। এই কারণেই তাঁহাদের অনেক কথা ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। যাঁহারা আর্য্যঋষিগণের প্রদর্শিত নির্গুণ তত্ত্বের সহিত প্রকৃতিস্থ গুণত্রয়ের লীলার বিষয় জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা "রাম না হইতে রামায়ণ" লেখার মত কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, নির্ব্বিকার আত্মা ও গুণত্রয়ের সবিকারী লীলা বুঝিবার জন্য মহাভারতের মূল কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য "বশিষ্ঠ-তীর্থের" বিষয় প্রথমে আরম্ভ করা গেল।

বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষ সংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ ॥
প্রশাম্য ত্যৌষধৈঃ পূর্ব্বো দৈব যুক্তি ব্যাপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি সমাধিভিঃ ॥"

চরক (সূত্রস্থানম্) ১ম অঃ ২৯।৩০।৩১।

অর্থাৎ পরমাত্মা নির্ব্বিকার। ইনি মন, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া চৈতন্য-সম্বন্ধে কারণস্বরূপ হন। ইনি নিত্য, ইনি দ্রষ্টা, ইনি সমুদায় ক্রিয়ার সাক্ষী-স্বরূপ ॥ ২৯ ॥ বায়ু, পিত্ত ও কফকে শারীরিক দোষ কহে। মনের দোষ রজঃ ও তমঃ। যাহা বিকৃত হইলে রোগ হয়, তাহাকে দোষ কহে ॥ ৩০ ॥ শারীরিক দোষ দৈব ও যুক্তির আশ্রয়দ্বারা শান্ত হয়, আর মনের দোষ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধিদ্বারা শান্ত হয়। [দৈব শব্দের অর্থ—স্বস্ত্যয়নাদি। যুক্তি শব্দের অর্থ—ঔষধযোগ] ॥ ৩১ ॥

(চরক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যশোদাবাবুর অনুবাদ)।

বশিষ্ঠ-তীর্থ।



মহাভারতের শল্য-পর্ব্বে (৺ কাশীরাম দাসের লিখিত মহাভারতের গদা-পর্ব্বে) এই তীর্থটীর উল্লেখ আছে। এই তীর্থের অপর নাম সরস্বতী তীর্থ। ভগবান্ বলদেব এই তীর্থসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"সরস্বতী তীর্থে বাস করিতে যাদৃশী রতি হইয়া থাকে, তাদৃশী রতি আর কোথায়? সরস্বতী-তীরে বাস করিলে, যাদৃশী গুণোৎপত্তি, তাহা আর কুত্রাপি নাই—ইত্যাদি।" বর্ত্তমান-কালধর্ম্মে তীর্থসমুহের মহিমা প্রায় অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার-দোষে দূষিত বলিয়া জ্ঞান থাকিলেও, এই তীর্থটী কোথায়, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। যদি অবস্থায় কুলান হয়, তবে এমন সুন্দর তীর্থটী দর্শনের অভিলাষও মনোমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উদিত হইল। যতদূর পারি, তীর্থটী কোথায়, জানিবার জন্য, আত্মীয়-বন্ধু পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহই বলিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির করিলাম যে, যদি তীর্থটীর বিষয় যত দূর পারি, লিখিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করি, তাহা হইলে যদি কোন সহৃদয় পাঠক ইহার তথ্য জ্ঞাত থাকেন, তবে কৃপা করিয়া আমার মানস পূরণ করিতে পারেন।

এই বশিষ্ঠ-তীর্থটীর ইতিহাস মহাভারতে সঙ্ক্ষেপতঃ এইরূপ বর্ণিত আছে;—পুরাকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের তপস্যা-বিষয়ে স্পর্দ্ধা-জনিত বৈরভাব ঘটিয়াছিল। কথিত আছে, পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র রাজা ছিলেন। তিনি মৃগয়ার্থ বন মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, বশিষ্ঠের আশ্রমে

উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কামধেনুর গুণে বশিষ্ঠের স্থানে যথোচিত আতিথ্য পাইয়া, কামধেনুটী গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে অক্ষম হইয়া এবং ঋষিবরের তপঃ-প্রভাব বুঝিয়া, রাজ্যত্যাগ করিয়া, বিশ্বামিত্র তপস্যাবৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় (ব্রাহ্মণেতর) বংশোদ্ভব বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব বশিষ্ঠের তুল্য হইতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহার মনে বশিষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব ছিল। সেই ধর্ম্মনিরত বিশ্বামিত্রের মনে ইহাই বিবেচনা হইল যে,—"সরস্বতী বেগবলে তপোধন বশিষ্ঠকে অবিলম্বে আমার নিকট আনিয়া দিলে, আমি সেই জাপক-শ্রেষ্ঠ দ্বিজবরকে অনায়াসে নিহত করিব, সন্দেহ নাই।" মহামুনি ভগবান্ বিশ্বামিত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, সরিদ্বরা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। ভগবতী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে বড় কোপন-স্বভাব বলিয়া জানিতেন। সুতরাং বিবর্ণা ও কম্পমানা হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে, মুনি বলিলেন—"তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অদ্যই তাহাকে নিহত করিব।" সরস্বতী এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন, এবং আদিষ্ট কর্ম্মকে পাপাত্মক, ও ভূমণ্ডল-মধ্যে বশিষ্ঠের প্রভাব অপরিমিত জানিয়া, অগত্যা বশিষ্ঠের নিকটে গমন-পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের কথা জানাইলেন। ধর্ম্মাত্মা মানব-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, তাঁহাকে শাপভয়ে কৃশা, বিবর্ণা, ভীতা ও চিন্তাকুলা দেখিয়া কহিলেন,—"হে সরিদ্বরে! তুমি শীঘ্রগামিনী হইয়া আমাকে বহন করিয়া আত্মরক্ষা কর।" মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে, সরস্বতী, বেগভরে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে লইয়া গেলেন, এবং তখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিধন করিবার জন্ত অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

দেবী সরস্বতী, বিশ্বামিত্রকে ক্রোধ-পরতন্ত্র-দর্শনে, ব্রাহ্মণ-বধ-আশঙ্কা-বশতঃ তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া, বশিষ্ঠকে পূর্ব্বদিকে লইয়া গেলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র ঋষি-সত্তম বশিষ্ঠকে অপবাহিত বিলোকনে অমর্ষণ হইয়া বলিলেন,—"হে নিম্নগে! যেহেতু তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া গমন করিলে, সেই কারণে তুমি রাক্ষস-কুল-ঈপ্সিত শোণিত বহন কর।" বিশ্বামিত্র মুনির এইরূপ অভিসম্পাতে সরস্বতী কিছুকালের জন্য শোণিত-মিশ্রিত তোয়রাশি ধারণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর, ঋষিগণ, দেবতা সকল, গন্ধর্ব্বকুল ও অপ্সর সমুদয়, সরস্বতীর তাদৃশ দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলে, সরিদ্বরা সরস্বতী পুনরায় নিজ-পথে আগমন করিলেন। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই বশিষ্ঠ বা সরস্বতী-তীর্থ বলিয়া খ্যাত।

সে তীর্থ এখন কোথায়? পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে দুইটী সরস্বতী নদী আছে। একটী ৺প্রয়াগধামে আসিয়া গঙ্গা-যমুনার সহিত মিলিত হইয়া 'যুক্ত-বেণী' তীর্থ হইয়াছে; আর অপরটী কলিকাতার অদূরবর্ত্তী ত্রিবেণীতে মিলিত ভাগীরথী-যমুনা হইতে বিযুক্তা হইয়া 'মুক্তবেণী' হইয়াছে। শেষোক্ত ত্রিবেণী যেন আধুনিক ও সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, মহাভারতোক্ত বশিষ্ঠ-তীর্থের সরস্বতী কোথায়—বা ঐ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী? পাঠক! বলিয়া দিতে পারেন কি? এখন, এ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী সম্ভব বা অসম্ভব দেখা যাউক।

ভারতের সরস্বতী দুইটীই নিতান্ত ক্ষীণা বা লুপ্তা। দুইটীরই প্রকৃতি প্রায় এক প্রকার। ভগবান্ বশিষ্ঠ এই পুণ্যতোয়ার স্তবকালে বলিয়াছেন,—"দেবি! তুমি পিতামহের 'মানস-সরোবর' হইতে নিঃসৃত হইয়াছ বলিয়া, তোমার নাম

সরস্বতী।” এ কথাটী কি? বশিষ্টদেব ভক্তির আবেগে বলিয়া ফেলিয়াছেন—না, প্রকৃতই ব্রহ্মার মানস-সরোবর নামক কোন সরোবর হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে? ঐ দুইটীর কোনটীরই মূল পাওয়া যায় না—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উঁহারা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তবে স্তবটী আর একটু পড়িয়া দেখা যাউক,—“আমরা তোমা হইতেই অধ্যয়ন করিয়া থাকি।” এ কথাটীর অর্থ কি? তবে কি এ সরস্বতী আমাদের উপাস্য দেবতা—বিদ্যা? জড়বাদী কি বলেন, জানি না; যাঁহারা শশিমুখী কন্যার বর্ণনা শুনিয়া গোলাকার মুখবিশিষ্ট একটী জীব দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা জানি না। তবে স্তবটী পাঠ করিয়া মনে হইতেছে, ইনি আমাদের সেই উপাস্য দেবীই বটেন। “যদি তাহাই হয়, তবে নিম্নোদ্ধৃত অংশেরই বা অর্থ কি?

“পূর্ব্বকূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপস্যা করেন মুনিবর॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম-কূলেতে॥”

(কাশীরাম দাসের মহাভারত।)

যদি উক্ত সরস্বতী নদী মূর্ত্তিময়ী বাক্‌দেবী হয়েন, তবে পূর্ব্ব-কূল পশ্চিম কূলের অর্থ—প্রাচ্যশিক্ষা ও পাশ্চাত্য-শিক্ষা বুঝিতে হইবে কি? মহাভারত বহুদিনের জিনিষ—তখনও এই হতভাগ্য ভারতভূমে “পাশ্চাত্য-শিক্ষা” ছিল, তাহা ত বোধ হয় না! তবে একমাত্র কামধেনু-সম্বল বশিষ্ঠের চরিত্র, ও তাহাতে লোভ-পরবশ বিশ্বামিত্রের চরিত্র, পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বশিষ্ঠ, বনচারী, তপঃপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, এক কথায় সত্ত্বগুণবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা জাতি, এবং

বিশ্বামিত্র, তপঃপরায়ণ, তেজোবন্ত, রজোগুণবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা রাজসিক জাতি। বিশ্বামিত্র ছলে বলে বশিষ্ঠের সেই ধর্ম্মরূপ সর্ব্বফলপ্রদ কামধেনুটী লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন সময়ে কোন মহাত্মা বশিষ্ঠকে হিন্দুর সহিত, এবং কামধেনুকে উহার সর্ব্বফলপ্রদ ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন; এবং রাজা বিশ্বামিত্রকে সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ কামধেনুকে লইবার চেষ্টা করায়, সেই ধেনুরই অঙ্গ হইতে ব্রাহ্ম প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছে, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মার কথার যেরূপ মিল দেখা যাইতেছে, তাহা যদি ঠিক্ মনে করা যায়, তাহা হইলে বশিষ্ঠ-তীর্থের কাণ্ড ত বর্ত্তমান সময়ের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষার দ্বন্দ্ব বলিয়াই মনে হয়। তাহাই কি? না, তাহাও ত হইতে পারে না; এখনকার ঘটনা দেখিয়া, তখনকার লিখিত ঘটনার কথা বলিলে চলিবে কেন? যদি বল, ঋষিদিগের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অন্যান্য লোকের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্র রূপ আবরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তা'ই বাল্মিকী মুনি শ্রীরামের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে রামায়ণ গাহিয়াছিলেন। যদি এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়া থাকে? দশে পাঁচে না বলিলে আমি বলিতে পারি না, অন্ততঃ বলা উচিত নহে। ক্ষমতাশালী মহাত্মাগণই বলিবার যোগ্যপাত্র। আর যদি সরস্বতী নদীর বিভিন্ন তীর, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্যক্তিগণের বিদ্যা ও জ্ঞানের বৈষম্য-নির্দ্দেশক-স্বরূপ, এবং বশিষ্ঠ-তীর্থ উক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিগণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের রঙ্গভূমি না হইল, তবে কি? তবে কি উহা ঠাকুরাণী দিদির উপকথা? তা'ই কি উহাতে নদী মানুষী হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণের বড়াই করিয়াছে? চিরদিনই এদেশে পতিত ব্রাহ্মণ আছে; তথাপি এখন পতিত বা

অনাচারী বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, ব্রাহ্মণ বলিলে সকলের মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় সত্ত্বগুণাত্মক জীব মনে হয় না। এখন কাহার কাহার মনে হয়, রাঁধুনি বামুন, সূত্রধারী (নামে, যজ্ঞসূত্রধারী) মানব। কখন কখন কাহার কাহার ব্যবহার দেখিয়া নরপিশাচ বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু কি করা যায়? যদি গুণীর অপ্রতুল হয়, তবে গুণ স্মরণ করিলেই স্বতঃই গুণী মনে হয়। আশা করি, পাঠকগণ! সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয়ের মোটামুটি ভাবটা জ্ঞাত আছেন। সুতরাং "সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির" কথা বলিলে, সহজেই সেই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি—অর্থাৎ বদন-মণ্ডল অপূর্ব্ব সন্তোষ-প্রভাযুক্ত, নয়নদ্বয়ে সরল অক্ষীণ সুশীতল কান্তি উদ্ভাসিত, কর্কশতা-হীন, ভয় ও সম্মানের পাত্র ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি—নয়ন-পথে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, যদি জগতে নিষ্কলঙ্ক শশী দেখিবার এত সাধ থাকে, যদি বিনাখাদে গঠিত অলঙ্কারের এতই প্রিয় হও, তবে গুণের উল্লেখ করিয়া গুণীর নাম নির্দ্দেশ কর। বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিতে যদি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি হেতু আপত্তি থাকে, তবে তাঁহাকে সত্ত্বগুণাত্মক ব্যক্তি বা—জাতি বলিতে বোধ হয়, কাহারও আপত্তি হইবে না। যদি ব্রাহ্মণেতর (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা ম্লেচ্ছাদি অপর কোন) নাম লইতে কাহারও আপত্তি থাকে, তবে রজোগুণবিশিষ্ট (অর্থাৎ দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, যশস্কামনা, প্রভুত্বপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট) ব্যক্তি বা জাতিই বিশ্বামিত্রের মূর্ত্তি বলিতে বোধ হয়, কাহারও আপত্তি হইবে না।

এই প্রকার গুণসম্পন্ন দুই ব্যক্তি বা জাতি, ভগবতী বিদ্যাদেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তি-ব্যঞ্জক দুই তীরে বসিয়া আছেন।

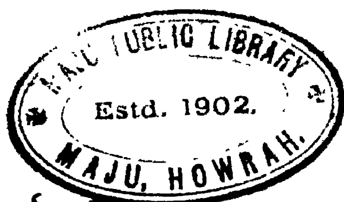
সত্ত্ব ও রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি চিরদিনই বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে করা যায়। তা'ই পুরাকালের—মহাভারতের সময়ের, ঐ দুই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, এখনও বর্ত্তমান বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে।, উভয়েই তপস্বী, উভয়েই বিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকেন। সেইজন্য পুরা: কালেও একদিন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যবাসী দুইজনে বা দুই দলে দ্বন্দ্ব হইয়া, তাহার ফলে, একের হস্ত হইতে বেদ-পুরাণাদি বাহির হইয়াছিল, আর অপরের হস্ত হইতে নানা-প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদি বাহির হইয়াছিল। এখনও তা'ই হইতেছে; অর্থাৎ এখন, সরিদ্বরা বিশ্বামিত্রের শাপ প্রাপ্ত হওয়ায়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে লোকহত্যা, লোকের কর্ম্মলোপ সুতরাং আহার লোপ, অপরের ফাঁকি দিয়া লইবার নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবিত, হইতেছে। যে আকাঙ্ক্ষায় এইরূপ করিতেছে, তাহাকেই রজগুণ-সম্ভূত লোহিতবর্ণ বলা যায়। পক্ষান্তরে কোথাও কোথাও ইহারই প্রভাবে গুপ্তহত্যার সংবাদও পাওয়া যায়। তা'ই বলি, যে বিদ্যাবলে এইরূপ ঘটিতেছে, তাহাই লোহিতবর্ণা সরস্বতী। তা'ই শুনিতেছি, বিশ্বামিত্র বলিতেছেন :—

"বশিষ্ঠ আছয়ে যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক কখনে॥
জলে একাকার করি ভাবাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে॥"

(কাশীরাম দাসের মহাভারত।)

তা'ই দেখিতেছি, আজ শাস্ত্রাদি আলোচনা ছাড়িয়া, কিসে পরস্বাপহরণ করিব, ইহার চিন্তাই পৃথিবীতে প্রবল হইয়াছে। তা'ই বশিষ্ঠের "অন্তর্ব্বাহ্য জ্ঞান"-হীনতার সুযোগ

বুঝিয়া, কল কারখানা, বাষ্পীয় যন্ত্র, বৈদ্যুতিক কাণ্ডে দেবী সরস্বতীর যে মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, তাহারই প্রভাবে বশিষ্ঠের সর্ব্বনাশ করিতে বিশ্বামিত্র কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু কিছু পরে তাহাতে অক্ষম দেখিয়া, শাপ-প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা যেন প্রথমে বশিষ্ঠকে ধ্যানস্থ দেখিয়া বাক্‌শক্তিহীন জন্তু বিশেষ মনে করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মসদৃশ প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তেমনি ধ্যানস্থ থাকিলেন দেখিয়া, তাঁহাকে শাপস্বরূপ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ শিক্ষা দিয়া তাহার হৃদয়ে রজগুণ ব্যঞ্জক লোহিতবর্ণের সরস্বতীর আবাস করিয়া দিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে শাস্ত্রাদি পুনঃ প্রকাশে বা আলোচনায়, গতাসু মুনিকে লইয়া দেবী সরস্বতী পলায়ন করিতেছেন, দেখিতেছি। এক্ষণে শাপগ্রস্তা সরিদ্বরা রক্তাক্তকলেবরা রাক্ষসের পেয় হইয়াছেন দেখিয়া, কোমৎ, এমার্সন, গেটে প্রভৃতি মুনিগণ আবার ব্যাকুল হইতেছেন। কিসে দেবী আবার নির্ম্মলা হয়েন, সেই চিন্তায় যেন জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন। এইরূপ পুনঃপুনঃ সত্ত্বগুণসম্পন্ন মুনিগণের আগমন হইলে, আবার সরিদ্বরা নির্ম্মলা হইবেন, এরূপ আশা করা যায়। পাঠক! এখন বলুন, কালের অঙ্গের যে স্থলে সরস্বতী ঐরূপ নির্ম্মলা হইবেন, সেই স্থল বশিষ্ঠ-তীর্থ কি না? যদি তাহা না হয়, তবে হে জড়বাদি! হে সঠিকবাদি (Positivist)! হে ভক্তবৃন্দ! আপনারা কৃপা করিয়া আমায় সেই মহাতীর্থ দেখাইয়া দিউন। আমি উক্ত সরিদ্বরার বিন্দুমাত্র নির্ম্মল সলিল গ্রহণ করিয়া উদ্ধার হই।



দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

"There is a circle throughout nature."—Emerson.

(পূর্ব্বাভাষ।)

কার্য্যগতিতে ভারতবর্ষের প্রায় বিভিন্ন প্রদেশ কয়টাই বেড়াইয়া আসিতে হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে মান্দ্রাজী বা দাক্ষিণাত্য বাসীকে সাধারণতঃ নগ্নপদ, (একখানি পরিধেয় বস্ত্র ও একখানি উত্তরীয়) যুগল বস্ত্রধারী, দীনবেশ দেখিয়া আসিয়াছি। উহাদিগকে দেখিলেই যেন সাধকের জাতি বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়। উহাদিগকে প্রধানতঃ তামিল এবং তৈলঙ্গভাষী দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে বোম্বাই, রাজপুতানা এবং পঞ্জাব প্রদেশের শস্ত্র ও শাস্ত্র আলোচনাকারী ভারতের পশ্চিম প্রান্তবাসী, তৎপরে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যভাগের সতেজ, দাম্ভিক, সরলচিত্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী এবং আমাদের বাঙ্গালা প্রদেশের ধর্ম্মভীরু, হীনতেজ, নিরীহ বঙ্গবাসী পর্য্যন্ত দেখিলাম। কার্য্যগতিতে এই সকল প্রদেশ-বাসীর সঙ্গে মিশিতে হইয়াছে। যাঁহাদিগের সহিত মিশিতে হইয়াছে, তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত হৃদয়-চিত্র (বা চরিত্র, Character) বেশ পরিষ্কার মনে না থাকিলেও তাঁহাদিগের জাতিগত হৃদয়চিত্র আমার মন হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। যখন মান্দ্রাজ, ত্রিচিনাপলি বা সোলাপুর নিবাসীকে মনে পড়ে, তখন যেন

তাঁহাদের জাতিগত সতেজ-নম্রতা, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণের মূর্ত্তি আপনা হইতেই মনে আইসে। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী ভদ্রলোকের সঙ্গেও আলাপ হইয়াছিল, প্রথমে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা ইংরাজী জানেন, বা ইংরাজী কোনকালে পড়িয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র বোধ হয় নাই। তাঁহাদের স্ব-প্রদেশীয় বেশভূষা, স্বাভাবিক নম্রতা ও ধীর-ভাব, বিলাতী বিকৃতভাবে পরিণত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী এবং বিশেষ করিয়া এই হতভাগ্য বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহাদের যেন অভূতপূর্ব্ব ভক্তি। এস্থলে বলিয়া রাখি, মান্দ্রাজে জাতীয় সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে এবং পরে, দুই সময়েই এই ভাব দেখিয়াছি। আমরা বাঙ্গালী বলিয়া যেন তাঁহাদের নিতান্ত আপনার লোক, আমাদের সঙ্গে কথা কহিয়া যেন তাঁহারা পরম আপ্যায়িত বোধ করেন। মোটামুটী তামিল ও তৈলঙ্গভাষী জনপদের এইভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত ও পঞ্জাবীদিগের প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি ও সুমধুর ভাষা নয়নপথে ও শ্রবণবিবরে যেন সদাই আসিতেছে।

ক্রমে উদ্ধতস্বভাব, সরলহৃদয়, হিন্দুস্থানী ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী সোদর প্রতিমগণের বিশালভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে।

অবশেষে ধীর, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় স্ব-প্রদেশীয়গণের কথাও মনে উদিত হইতেছে।

উক্ত সকল প্রদেশীয় কয়েকজনের সহিত কার্য্যগতিকে শত্রুতা মিত্রতা উভয়ই ঘটিয়াছে, এবং তাহারই ফলে উক্ত চরিত্র-চিত্র আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছে। যাহা হউক, ঐ কয় প্রদেশে ভারতবর্ষকে প্রধান পাঁচ ভাগে

বিভক্ত মনে করিলে পাঁচখানি চিত্র স্বতঃই নয়নপথের গোচর হয়। এবং মনে হয়, এরূপ বিভিন্ন ভাবাপন্ন এক দেশ-বাসী কি কখন এক হইতে পারে?

(পরিচয়।)

কিছুদিন পরে প্রবাস হইতে আসিয়াছি, এমন সময় একদিন সন্ধ্যার পর মহাভারত পড়িতে বসিলাম। মহাভারত খুলিবামাত্র সভাপর্ব্ব—"পাশাখেলা" বাহির হইল। সেইস্থানটী পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে দ্রৌপদীর নির্য্যাতন ও পাণ্ডবের বনবাস পর্য্যন্ত পড়িলাম। পাঠ সাঙ্গ হইলে, কিছু পরে নিদ্রা গেলাম। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নবৎ অনেক কথা মনে হইয়াছিল। সকল কথা যদিও এখন মনে নাই; তবে কথাগুলি যেন কেমন কেমন বোধ হইল, সেইজন্য লিখিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হইল। পণ্ডিতেরা উহার বিশিষ্ট টীকা করিয়া দেখিলে, কথাগুলি তাঁহাদের সঙ্গত বোধ হয় কি না, জানি না। তবে পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ সত্বরজতম গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক ধরিয়া যে সকল চরিত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে স্থায়ী চরিত্র বলিয়াই মনে হয়, এবং তদনুসারে যে সকল কথা মনে হইয়াছিল, তাহা মোটামুটি অযথা বোধ হইতেছে না। এইজন্য আশা করি, কোন সহৃদয় পণ্ডিত পাঠক ইহার ন্যায়-সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।

মনে হইল,—মহর্ষি ব্যাসদেব ভারতের উক্ত প্রধান পঞ্চ প্রদেশবাসীর চরিত্র লইয়া হয়ত পাঁচখানি পাণ্ডব-চরিত্র গড়িয়াছেন। যথা:——

(১) চরমোৎকর্ষ-প্রাপ্ত বাঙ্গালীর ভাব ধরিয়া যুধিষ্ঠির। বাঙ্গালী ধর্ম্ম-ভীরু, ধর্ম্ম-প্রিয়,—বাঙ্গালীরই হৃদয়ক্ষেত্রে চৈতন্য-

লীলা—বাঙ্গালীরই হৃদয়ক্ষেত্রে "গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা" তন্ত্রের বিকাশ,—বাঙ্গালীই মহামায়ার প্রধান সেবক ইত্যাদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কাণ্ড এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মভাব তুলনা করিলে, যেন অনেক মিল পাই। যুদ্ধকার্য্যে বাঙ্গালীর এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যিক বিকাশ একই প্রকার বলিলে, বোধ হয় অন্যায় হয় না। অবশেষে মহাত্মা (!) মেকলে কর্ত্তৃক বাঙ্গালীর মিথ্যা-বাদী বদ্‌নাম টুকু পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের সহিত মিল পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত অর্জ্জুনাদি চরিত্র বুঝিবার প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে আরও বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে।

(২) ভীমের ভীমত্বের সঙ্গে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীর চরিত্রগত মিল সহজেই অনুমিত হয়। উভয়েই সরলচিত্ত, উদ্ধত এবং মহা পরাক্রমশালী। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নেতা পাইলে ভীম যেমন রণক্ষেত্রে অজেয় বলিয়া বোধ হয়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বাসীদিগের পরাক্রমশালিতা তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। পাশাখেলার কাপট্য না বুঝিয়া তদুপলক্ষে সরলচিত্তে রাজ্যনাশের এবং তাহার পর আপনাদিগের দুরবস্থা ভাবিয়া ভীমই কেবল (কখন স্বয়ং কখন বা দ্রৌপদীর সঙ্গে যোগ দিয়া) যুধিষ্ঠিরকে মধ্যে মধ্যে বাক্য-যন্ত্রণা দিয়াছেন। আর এইরূপ ক্ষেত্রেই হিন্দুস্থানীর সহিত বাঙ্গালীর মনোমালিন্য মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

(৩) পঞ্জাব হইতে মহারাষ্ট্রীয় দেশ পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিমস্থ ভূভাগে কি ধর্ম্মভাব, কি বীরত্ব, উভয়বিধ দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। শিখ, রাজপুত এবং মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাসই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। নানক, কবীর, গুরুগোবিন্দ, মহারাণা প্রতাপসিংহ, শিবজী, বাজীরাও পেশোয়া এবং রামশাস্ত্রী, এই খণ্ডে বৈদান্তিকতার ও কার্য্য

ক্ষমতার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তা'ই বলি, ইহাদের ভাব লইযা অর্জ্জুন সৃষ্ট হইয়াছেন।

পাণ্ডবগণের মধ্যে কার্য্য-ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের যে স্থান, তাহাতে তাঁহার প্রসঙ্গ আর একটু পরিষ্কার করিয়া দুই একটা উদাহরণ দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বোধ হয়, সকল চরিত্রগুলি বুঝিবার পক্ষে একটু সুবিধা হইতে পারে। বাঙ্গালী একবারে "বিশ্বপ্রেম" লইযা ব্যস্ত, কিন্তু পঞ্জাবী ধর্ম্ম-সংস্কারক স্বদেশের প্রেমে উন্মত্ত। ভ্রাতাগণ যতই কষ্ট পাউক, যুধিষ্ঠির সত্যের জন্য ব্যাকুল; আর অর্জ্জুন ভাই-দিগের জন্য ব্যাকুল। অর্জ্জুন অস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য স্বর্গে যাইতেছেন। হিমাদ্রি পর্ব্বতের পর বহুদুঃখে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উঠিলেন। তথায় উঠিয়া শূন্য বাণীতে শুনিলেন :—

"অগ্রে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে।
শুনি পার্থ মহাবীর রহিল তাহাতে॥
হেনকালে দেখিলেন জটিল তপস্বী।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন নিকটেতে আসি॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি॥
অস্ত্রধারী হৈয়া তুমি এলে কি কারণ।
এ পর্ব্বতে নিবসে নিঃস্বামী যত জন॥
ধনু অস্ত্র ফেলহ ফেলহ শর তূণ।
দিব্যগতি পেলে অস্ত্রে কিবা প্রয়োজন॥
বড় তেজোবন্ত তুমি আইলা সে কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈয়া রহেন অর্জ্জুন॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর।
বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর॥

করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বরদান।
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ॥
ইন্দ্র বলে হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে॥
পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আইনু ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে॥"

(কাশীরাম দাসের মহাভারত, বনপর্ব্ব।)

এইত অর্জ্জুনের কথা। আর শিখ-গুরু গোবিন্দজীর একটী স্তব এই সঙ্গে পাঠ করিয়া দেখা যাউক। শক্তি স্বরূপা ৺ নয়নাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ স্তব পঠিত হয়।

"নমঃ উগ্রদন্তী অনন্তী সবইয়া॥ নমো যোগেশ্বরী যোগ মায়িয়া॥ ১॥ নমো কেহরী (১) বাহনী শত্রুহন্তি॥ নমো সারদা ব্রহ্মবিদ্যা পঢ়ন্তি॥ ২॥ নমো ঋদ্ধিদা সিদ্ধিদা বুদ্ধিদায়নী॥ নমো কাল্কে কাল্কো কাল্ছেনী॥ ৩॥ নমো কাল আজাল হা হের তেরো॥ নমো তিহুঁলোক কিনো আহেরো॥ ৪॥ নমো জ্যোতি জ্বালা তোমে বেদ পায়েঁ॥ সুরাসুর রিখি (২) সুর নহি ভেদ পায়েঁ॥ ৫॥ তুহি জয় করন্তি অসুর গহি পচ্ছারে॥ তুহি যোগ যুগ্তনি তুহি খড়্গ ধারে॥ ৬॥ তুহি যোগিনী খপ্রভরণী অদোখং॥ রক্তবীজকো প্রাণকে পাকড় সোখং॥ ৭॥ তুহি জল থলে পর্ব্বতে গিরি নিবাসী॥ তুমি সভঘটন্মো নিরলম্ প্রকাশি

(১) কেশরী। (২) ঋষি।

.॥৮॥ তুহি দুষ্ট দাহনি তুহি সর্ব্বপালী॥ তুহি বৃছ (৩) পোঁপা (৪) তুহি আপমালী ॥৯॥ তুহি বিশ্বভরণী তুহি জগ্ প্রকাশি॥ তুহি আলথ্ বরণী তুহিভূ আকাশী॥১০॥ নমো জলপা দেবি দুর্গে ভবানী॥ তিহুঁলোক নব খণ্ডমৈ তুম প্রধানী॥১১॥ অটলছত্র ধরণী তুহি আদি দেবং॥ সকল মুনিজনা তোহি নিশদিন সরেবং॥১২॥ তুহি কাল আকাল কি জ্যোতি ছাজৈ॥ সদাজয় সদাজয় সদাজয় বিরাজে॥১৩॥ এহি দাস মাঙ্গে কৃপাসিন্ধু কিজৈ॥ স্বয়ং ব্রহ্মকি ভক্তি সর্ব্বত্র দিজৈঃ॥১৪॥ তুহি জাগতি জ্যোতি জ্বালা স্বরূপং॥ তুহি সকল জগমৈ রমন্তি অনুপং॥১৫॥ মহামূঢ় হাঁও দাসস্তেহাবা॥ পাকড় বাহুঁ (৫) ভবজল কর বেগপাবা॥১৬॥ ফতেহি ডঙ্ক বাজৈ কৃপা ইয়ং করিজে॥ এহী বাবতা দাস কি নিৎ শুনিজে॥১৭॥ করহ হুকুম্ আপনা সকল দুষ্ট ঘাযু॥ তুবক্ হিন্দ্‌কা সকল ঝগরা মিটাযু॥১৮॥ আগম সুববীরে উঠে সিংহ যোধা॥ পাকড়্ তুর্ক ননকো করেঁ বৈ নিরোধা॥১৯॥ সকল জগৎমো থালিসা পন্থরাজে॥ জগেধর্ম্মহিন্দু তুরগ্‌দ্বন্দভাজে॥২০॥ জপৌ জাপ্ একা হবে হরি অকালং॥ হবৈ সবদুনী তব নিচ্ছকমে নেহালং॥২১॥ শুনো তুম্ ভবানী হামন্ কি পুকারে॥ করো দাস পর মেহেব আপ্‌বম্ অপারে॥২২॥"

[এস্থলে বলিয়া রাখি, এখানে হিন্দু মুসলমান লইয়া কথা হইতেছে না। মুসলমানেরাও এখন হিন্দুদিগের ন্যায় ভারতবাসী; সত্যপীর এখন সত্যনারায়ণ হইয়াছেন। সুতরাং

(৩) বৃক্ষ। (৪) পুষ্প। (৫) বাহু।

এখানে হিন্দু মুসলমানের তর্ক উঠান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলবাসীর স্বদেশানুরাগ দেখাইবার জন্যই উক্ত স্তব উদ্ধৃত হইয়াছে।]

এরূপ আরও অনেকগুলি স্তব শিখদিগের নিত্য পাঠ্য। ইহা নিতান্ত কবির কাব্য বলিয়া পঠিত হয় না। ইহা দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভাবে পাঠ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কথিত আছে যে, গুরুগোবিন্দজী এইরূপ কয়েকটী স্তব পাঠ করিয়া ৺ নয়নাদেবীকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সম্মিলিত এরূপ স্তবাদি ভারতের ঐ অঞ্চলেই শুনিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য অঞ্চলে "স্বয়ং ব্রহ্ম কি ভক্তি সর্ব্বত্র দিজৈ" এরূপ কথা বিস্তর শুনিয়াছি; "মহা মূঢ় হাঁও দায়ন্তেহারা, পাকড় বাঁহু ভবজল করো বেগ পারা" এরূপ কথাও অনেক শুনিয়াছি। নিজের জন্য অথবা একবারে বিশ্বের জন্য ভাবিতে বা কাঁদিতে অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু,

"গর্ভে জন্ম নিয়েছ যার,
জননী সে তোমার,
কৈ বন্ধন মুক্ত কল্লে তার,
এবে যশোদার বন্ধন স্বীকার করেছ॥"

—একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছিল, তবে আর অন্য পরে কা কথা। মায়ের বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য ভগবানকেও স্তব স্তুতি করিয়া জানাইতে হয়।

অর্জ্জুনের ন্যায় মহাপুরুষগণ স্বর্গসুখ পাইয়াও ভাইদিগের দুঃখ ভুলেন না,—ইহাই অর্জ্জুনের অর্জ্জুনত্ব। অন্যান্য পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভাইদিগের জন্য টান ছিলনা, একথা বলি না। তবে অর্জ্জুনের যথাসর্ব্বস্ব জপ, তপ সকলই ভাইদিগের জন্য, নিজের স্বর্গ-সুখের জন্য নয়। ভাইদিগের

প্রতি যুধিষ্ঠিরের যে টান ছিল, তাহা ধর্ম্মভাবে পনের আনা তিন পাই ঢাকা। বাঙ্গালা প্রদেশের তন্ত্রাদিতেও সেই ভাব দেখা যায়।

(৪) ও (৫) তামিল ও ত্রৈলঙ্গভাষীদিগকে (মান্দ্রাজ বা) মদ্ররাজ তনয়ার পুত্রদ্বয় অর্থাৎ নকুল ও সহদেব ভাবিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না। ইহাঁরা বীরত্বে নিতান্ত ন্যূন নহেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আর্য্যাবর্ত্ত বাসী-দিগের প্রতি ইহাঁদের জ্যেষ্ঠ-বুদ্ধি বিলক্ষণ। আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী যখন যাঁহার অধীনে থাকেন, ইহাঁদের পরিচয় অবধি, ইহাঁদিগকেও তাঁহারই অধীনে দেখা যাইতেছে। ইহারা প্রধানতঃ অনার্য্যভাষী হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষকে এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্ত মনে করিয়া, আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এখন পর্য্যন্ত শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা এবং শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তিকে জন্ম দিয়া দাক্ষিণাত্য ভূমিও প্রকৃতই আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলেই বর্ত্তমান কালে জাতীয় মহা সম্মি-লনের সময়োচিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। সহদেবই পাণ্ডবদিগের মধ্যে পুঁথি পাঁজি সবিশেষ নাড়াচাড়া করিতেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদির সময়োচিত কারণ-সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন করিতেন। এই সকল মিল দেখিয়া ইহাঁদিগকে নকুল ও সহদেবের স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের ইতিহাস ভারতবাসীর ইতিহাস অথবা এই পাঁচটী জাতি কোনকালে পাঁচ ভাই ছিল, এক্ষণে এক একজনের বংশে এক এক প্রদেশবাসী লোক হইয়াছে, এরূপ ভাবা যাইতে পারে। কিন্তু যদি এক এক প্রদেশবাসীই এক একজন পাণ্ডব বলিয়া অভিহিত হইয়া-ছেন, এরূপ মনে করা যায়; তাহা হইলে তাঁহাদের

জন্ম ব্যাপারটী আর অদ্ভুত মনে হয় না। এক এক প্রদেশ্ কিরূপে ঐ সকল গুণ-সম্পন্ন লোক দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই ইতিহাস মাত্র বলিয়া মনে হয়। আর ভোজরাজ তনয়া কুন্তী বা পৃথাই যে আর্য্যাবর্ত্ত, এবং ক্রমে প্রসারিত হইয়া ভারতবর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

দ্রৌপদী-সম্বন্ধে এইরূপ ভাব মনে হইয়াছিল, যে, অযোনি-সম্ভবা পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী পাঞ্চালী পঞ্চ দেবোপাসক হিন্দু বা পাণ্ডবপত্নী অথবা ভারত সমাজের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা ভারতের রাজলক্ষ্মী ব্যতীত আর কে হইতে পারেন? ইহাঁর অপর একটি নাম কৃষ্ণা—ইহাঁর ব্যাপার দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই বোধ হয়, ইহাঁকে কৃষ্ণবর্ণা করা হইয়াছে। ইনি পাণ্ডবগণের মনোমধ্যে অবস্থিতি করেন। জড়মূর্ত্তি ইহাঁর নাই বলিয়াই, ইনি অযোনি সম্ভবা—মাটীর সঙ্গে ইহাঁর সাক্ষাৎ সংস্রব নাই। ইহাঁর পিতা পাঞ্চালরাজ। বৈয়াকরণিকেরা বলিতে পারেন, পঞ্চ শব্দের সঙ্গে পাঞ্চালির সম্বন্ধ কি? ইহাঁর জন্মস্থান পাঞ্চাল, এবং ইহাঁর স্বামীও পঞ্চজন। এই পঞ্চজন কি, তাহা কবি, বৈয়াকরণিক অথবা বিজ্ঞানবিদ্ যদি স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে বোধ হয়, প্রকৃত পাণ্ডব ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়। নিস্ক্রিয়াবস্থার, বা স্বপ্নবৎ চিন্তার, কথা তর্কে টিকে না।

শুনিয়াছি, কোন মহাত্মা না কি পঞ্চ পাণ্ডবকে পঞ্চভূত ও দ্রৌপদীদেবীকে বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের ভাগ্যদোষে উক্ত মহাত্মা এখন আর ইহ জগতে নাই, এবং তিনি কিরূপ ধরণে ঐ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাও আর এখন দেখিতে পাইবার

উপায় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে ভারতে উক্ত পাণ্ডব প্রকৃতিক জাতিগণকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, পুরাকালেও ঐরূপ জাতি বা ব্যক্তি ছিল, অথবা কবি-কল্পনায় ঐরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট. পঞ্চভ্রাতাব সৃষ্টি হইযাছিল। প্রত্যক্ষই যদি কল্পনাব উপজীব্য হয়, তবে কবি হয়, সত্ত্বরজস্তম গুণ-ত্রয়ের ন্যূনাধিক সমাবেশ কবিযা, অথবা প্রত্যক্ষ ঐরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি বা জাতি দেখিয়া পঞ্চ পাণ্ডবেব চরিত্র গড়িয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি উহা ব্যক্তিগত ধরা যায়—তাহা হইলে উহাদেব জন্মকথা কেমন কেমন ঠেকে—অর্থাৎ আমাদেব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। কিন্তু জাতিগত ধবিলে, জননী জন্মভূমি কুন্তীদেবীর সন্তান বলিলে যেন কতক বুঝিতে পারা৹ যায। আর উক্ত মহা-পুরুষেব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া৹ বোধ হয়, ব্যাসদেব উহা কেবলমাত্র সোজাসুজী পাঁচটী ভাইয়ের গল্প লেখেন নাই, হয় ত উহার কতক ঐতিহাসিক, কতক কবি কল্পনা। কিন্তু কতদূর ঠিক, কতদূব কবিকল্পনা, তাহা বলা যায় না। তবে চবিত্রগুলি যেরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা এখনও দেখা যাইতেছে, এবং উহাদের সহিত প্রকৃতি-গত মিল এবং কোথাও কোথাও জাতিব নামে শব্দ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। ইহাতেই বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমান ভারতবাসী না হউক, এইরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোন জাতি বোধ হয় কোন সময় ছিল, এবং তাহাদিগকে উপলক্ষ করিযা ব্যাসদেব মহাভারতের ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

যদি তাহাই হয়, তবে কুরুর ন্যায় এক জাতি ছিল, যাহাদের কর্ত্তা অন্ধ—শাস্ত্রানুসারে রাজা না হইলেও কার্য্যতঃ

রাজা ছিলেন। (অন্ধ অনেক প্রকারের হয়। যাহার চক্ষু নাই, সে অন্ধ; যে দেখিয়াও বুঝিতে পারে না, সেও অন্ধ; আর যে দূরে থাকিয়া দেখিতে পায় না, সেও এক প্রকার অন্ধ।) নিজগণের প্রতি তিনি এতই মায়াবদ্ধ যে, ধর্ম্মতঃ বাৎসল্য ভাবাপন্নদিগের প্রতি দ্বেষ-পরবশ ছিলেন। অন্ধরাজ মুখে বা মনে যদিও অধিকাংশ সময়েই ন্যায়পথে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদির ন্যায় মহামতিগণের পরামর্শানুসারে চলিতে চাহিতেন; কিন্তু কার্য্যতঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণেরা শকুনি ও কর্ণাদির সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা বলিতেন, তাহাই দাঁড়াইত। এমন কি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে ভীষণদৃশ্য দেখিয়া দ্রৌপদীকে অভয় দান করিলেও আবার দ্যূত ক্রীড়া চলিযাছিল।

এখন বলা যাইতে পারে, কুরু-পাণ্ডবগণের ইতিহাস যদি উক্ত প্রকার কোন জাতির ইতিহাস হয়, তাহা হইলে একপক্ষে উহার অনেক আপাত-অসঙ্গত কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; এবং অপর পক্ষে উহা হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কথাও পাওয়া যায়। তা'ই বলি, পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন মহাভারতের নানা ব্যাখ্যা দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ ইহার এই ভাবটী দেখিলে, আরও অনেক তথ্য বাহির হইতে পারে।

(প্রমাণ।)

মূল মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি মহাত্মা কাশীরাম দাসের মহাভারতে বেশ অল্প কথায় বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য এস্থলে কাশীদাসী মহাভারত হইতে কয়েকস্থল উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে আমাদের কথা সঙ্গত, কি না, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। দ্রৌপদী নির্য্যাতনের সময় উভয়দলের একটী বিশেষ সংঘর্ষের সময়।

এইরূপ সময়েই প্রায় চরিত্র প্রস্ফুট হয়, এবং ঐরূপ স্থল পাঠ করিয়াই আমার হৃদয়ে কুরু-পাণ্ডবের চিত্র এরূপভাবে উদিত হইয়াছে।

পাশাখেলা হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডবগণ কপট পাশায় পরাজিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কর-কবলিত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের রাজলক্ষ্মী স্বরূপিণী দ্রৌপদী একমাত্র ধর্ম্ম-বস্ত্রে আচ্ছাদিতা হইয়া, দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকর্ষিত অবস্থায় সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ করিয়াছিলেন কি না? তাহার উপর কুরুর সত্ত্ব-সাব্যস্থ হইয়াছে কি না? এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এমন সময় কুরু-কুলোদ্ভব সহৃদয় বিকর্ণ বলিতেছেন :—

"সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণে।
দ্রৌপদীর প্রত্যুত্তর নাহি দেহ কেনে॥
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ লোক হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর থাকে নরক ভিতরে॥
এ যে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥
এ তিন জনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি কারণ॥
* * * *
পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদী কহিল বারবার।
যার যেই চিত্তে আছে করহ বিচার॥"

এই স্থলে বলি—স্বয়ং কুরুকুলোদ্ভব হইয়াও বিকর্ণ যেরূপ বক্তৃতা করিতেছেন, ইহা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

নিকট এখন নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। তবে রাজকার্য্য চালনা-সম্বন্ধে তিনি যে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর এই তিনটী শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও স্থায়ী শক্তি কি না দেখা যাউক।

(১) ভীষ্ম—ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং পাণ্ডবগণের বর্ত্তমানের পূর্ব্বেও ছিলেন। ভীষ্ম সম্বমী। ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। ভীষ্ম অন্তিমে শয্যাশায়ী। ভীষ্ম যাহার পক্ষে, তিনি লক্ষ্মী লাভ করিবেন, ইহা কুরু পাণ্ডব উভয়েই স্বীকার করেন। ভীষ্মই কুরু-কুলকে পোষণ করিয়াছেন। স্মরণীয় কামজয়ী যোগী অর্জ্জুনের শরেই ভীষ্ম ভূতলশায়ী—ইত্যাদি। ভীষ্মের এইরূপ নানাগুণ বা কার্য্য-কারণদর্শী ভাবগুলির সহিত ব্যবসা (Commerce) শক্তির মিল পাওয়া যায়। এই সঙ্গে যতগুলি কথা মনে হইয়াছিল, সে গুলি বলিতে হইলে ভীষ্মপর্ব্বের জন্য একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এস্থলে আমাদের দেশের মাড়য়ারী প্রভৃতি ব্যবসাদার জাতির সংযমী ধরণ, অন্নদাতার প্রাধান্য স্বীকার, ইত্যাদি গুণ মনে হইয়াছিল।

(২) ধৃতরাষ্ট্র—অন্ধ। স্বগণের প্রতি মায়াবদ্ধ। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁর পতিব্রতা পত্নী স্বামীর সহিত সমব্যথিত হইবার জন্য নিজ অক্ষিদ্বয় বিবাহের পর হইতে চিরদিন বস্ত্রাবৃত রাখিয়া অন্ধের ন্যায় ছিলেন। এই রাণী গান্ধারীর কথাতেই পাশাখেলা একবার নিবৃত্তি পায়, এবং পাণ্ডবগণকে অভয় দান করা হয়। এইরূপ সকল কারণে স্বপ্নদৃষ্ট কুরুসভায় ধৃতরাষ্ট্রকে রাণী গান্ধারীর অধীনস্থ রাজশক্তি মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল।

(৩) বিদুর—দীন ভাবাপন্ন, ভগবদ্ভক্ত। দীনভাব এবং ভগবদ্ভক্তি হইতেই তিনি পাণ্ডবের ব্যথার ব্যথী। রাজসভায়

প্রজাশক্তি দ্বিধা বিভাজিত। একদল ব্যবসায়াদি শক্তিবলে সম্মানিত, অপর দল দরিদ্রতা নিবন্ধন হেয়। কিন্তু অপর দল হেয় হইলেও, দরিদ্রের সহায়। এই মূর্ত্তিই শেষ পর্য্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামী। এইরূপ সকল কারণে, ভীষ্ম সম্মানিত রাজকুলোদ্ভূত প্রজাপুঞ্জের শক্তি এবং বিদুর দরিদ্র প্রজা-শক্তি মূর্ত্তিরূপে দেখা দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এক্ষণে বিকর্ণের কথা আরও শুনা যাউক :—

"এইমত পুনঃ পুনঃ বিকর্ণ কহিল।
একজন সভায় উত্তর না করিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর॥
* * * *
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলে উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সর্ব্ব নরবর॥
* * * *
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেক সুবল নন্দন॥
অগ্রে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপরে কিবা প্রভু পণ আছে॥
* * * *
সে কারণে দ্রৌপদী পাশায় নহে জিত।
তোমরা কি বল, বলে মম এইচিত॥
বিকর্ণ বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন॥"

পাঠকগণ! ভাবিয়া দেখুন দেখি, উক্ত পঞ্চজাতির জীবনে এদৃশ্য ঘটিয়াছে কি না? যদি ভাল বুঝিতে না

পারিয়া থাকেন—যদি সে সকল কথা মনে না পড়িয়া থাকে, তবে দুর্য্যোধনের একজন প্রধান মন্ত্রী কর্ণ কি বলিতেছেন—শুনুন। কর্ণ কুন্তীপুত্র, কিন্তু আপনা ভুলিয়া একেবারে কুরু-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এ হেন কর্ণ কি বলিতেছেন—শুনুন ;—

"বিকর্ণ বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধন চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥"

পাঠক মনে ভাবিয়া দেখুন,—ভারত সন্তানের প্রতি মিষ্ট-বাক্য কহিয়া কে কেমন মুখতাড়া খাইয়াছেন। তাহা দেখিলেই সেই স্বপ্নময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, কর্ণের কথা আরও শুনুন :—

"সবে বলে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি করে কোন জনে॥"

এ কথাটার অর্থ পাঠক মনে পড়ে কি ?

সে যাহা হউক, ইহার পর কর্ণ আরও কি বলিতেছেন, দেখা যাউক :—

"আর যে বলিলা কৃষ্ণা এক বস্ত্র কায়।
সভামধ্যে ইহারে আনিতে না যুয়ায়॥
কি তার গর্ব্বিত গুরু কিবা ভয় লাজ।
বেশ্যাজনে কেন লজ্জা আসিতে সমাজ॥
যতেক সংসারে এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী নির্ম্মাণ করিল॥

দুই স্বামী হইলে বলি সে বিচারিণী।
পঞ্চ স্বামী হৈলে পরে বেশ্যা মধ্যে গণি॥"

হিন্দুজাতি মূলে অদ্বৈতবাদী; কিন্তু সাধনার জন্য দ্বৈত বাদী এবং পঞ্চোপাসক। হিন্দুর শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা না করিয়া, এখনও পর্য্যন্ত জল গ্রহণ করেন না। এতদ্ব্যতীত বিজাতীয় ভাবাপন্ন হিন্দুগণ বিজাতীয় দেব পূজারও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, একথাও মহাভারতের স্থানান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, হিন্দুর অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, পঞ্চ-দেবোপাসনা, তেত্রিশ কোটী দেবতা, এ সকল ব্যাপার অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বুঝিতে পারেন না। বোধ করি, হিন্দু ব্যতীত অপর জাতীয়েরা উক্ত ভাবটী সম্বন্ধে কিরূপ বলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য ব্যাসদেব একপ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ যে কৃষ্ণের একান্ত অনুরাগী ছিলেন, অর্জ্জুন যাঁহার বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, কুরুগণ তাঁহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তবে ভীষ্মাদি মহাত্মাগণ কিছু কিছু বুঝিলেও, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই দেখাইতে পারেন নাই; এবং সেই জন্য এত অত্যাচারেও ভীষ্মাদি নিস্তব্ধ। কর্ণ কুরুভাবে বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দু। তাই কর্ণ বলিলেন:—

"সভায় আনিতে বেশ্যা লাজ তার কিসে।
এইমত বিচার আমার মনে আইসে॥"

দ্রৌপদী পাণ্ডবের বা হিন্দুর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখী বলিয়া বর্ণিতা। তিনি যে সময়ে একমাত্র ধর্ম্মবস্ত্রে আচ্ছাদিতা, সেই সময় কুরুসভায় আনীতা। এক্ষণে সেই বস্ত্র ধরিয়া টান পড়িয়াছে। যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ভীম রোষকষায়িত-লোচন হইলেও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবর্ত্তী,

অপর তিনজন পাণ্ডবও তাঁহাদের অনুগত, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদের হৃদয় আলোড়িত হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল, এবং তাঁহারা জ্ঞানবলে সেই আলোড়নের বেগ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নিসর্গ এ ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না; সভার বাহিরে গৃহ দাহাদি কাণ্ড ঘটাইতে লাগিলেন। একণে সেকথা বুঝিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, কুরুগণের দাবী কি? তাঁহারা দ্রৌপদী বা পাণ্ডবগণের নিকট কি চাহিতেছেন? এই জন্য পাঠক! একণে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের কথা শুনুন। দুর্য্যোধন বৈভবটাই বুঝেন;—

"দুর্য্যোধন বলে এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচারতত্ত্ব ধর্ম্ম সূক্ষ্মগতি॥
তবে আজ্ঞা করিল নৃপতি দুঃশাসনে।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র আভরণে॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতে আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥"

হে পণ্ডিতমণ্ডলী! "দুঃশাসন" কে, তাহা আমি আপনাদের মতে জানিলাম কি না, তাহা জানি না। তবে "কুশাসন" বা "অন্যায় শাসন" এই ভাবই আমার মনে আসিয়াছিল। যদি ইহাতে দোষ হয়, তবে স্বপ্নদৃষ্ট ভাব বলিয়া ক্ষমা করিবেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধন অপশাসন দ্বারা ভারতের পঞ্চ প্রদেশবাসীর বস্ত্রালঙ্কার চাহিলেন।

"এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ সহোদর।
বস্ত্র অলঙ্কার ফেলি দিলেক সত্বর॥

এস্থলে যেন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ বলিয়া উঠিলেন, "হা হা! কি বোকা, কি বোকা!" কিন্তু কাশীরাম সে কথা কিছু বলেন নাই। এখন:—

"এক বস্ত্র পরিধান দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে পিন্ধনেতে ধরি ॥
ছাড় ছাড় বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরিয়া অঙ্গের বস্ত্র কাড়ে ॥"

দেবীর চীৎকার রাজ্যাধিকারী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। দুর্য্যোধনেরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে লাগিল। কিন্তু দেবীর এখন উপায়:—

"সঙ্কটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে দেবরায় ॥"

তাই যেন চারিদিকে এখনও "হরি"-ধ্বনি শুনিতেছি। ইচ্ছা হয়, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি কাশীরাম যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করি; কিন্তু প্রস্তাবের দীর্ঘতা ভয়ে তাহা করিতে পারিলাম না।

পরে,——

"দ্রৌপদী আকুলা জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম বিপদ ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্য ধর্ম্ম করিতে পালন ॥
আকাশ মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্ব গায় ॥
লোহিত পিঙ্গল সিত, নীল শ্বেত বিরচিত,
নানাচিত্র বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥"

পাঠকগণ! এই সময় একবার দেখুন দেখি, সে বস্ত্রগুলি কেমন? ঐ দেখুন, ধর্ম্মরূপ বস্ত্র ধরিয়া টান পড়িয়াছে; উক্ত রাশি রাশি শাস্ত্র প্রকাশ, শাস্ত্রীয় আন্দোলন, ভগবৎ-চিন্ত হইয়া আত্মসংযম পূর্ব্বক আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন, এইরূপ সকল বোধ হয় সেই নানাবর্ণের শাড়ীর মত হইয়াছিল। আত্মসংযমটী ঠিক যেন পাক দিয়া নিজ বস্ত্রে নিজকে রক্ষা করা বলিয়া বোধ হইতেছিল।

যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ চেষ্টায় ভীষণকাণ্ড হইতেছে, তখন রাজ্যমধ্যে মহাবিপত্তি পড়িয়া গেল। কাজেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মিষ্টবাক্যের আবশ্যকতা হইল। তখন উক্ত পঞ্চ-পাণ্ডবকে কতকটা মুক্তি দিয়া আবার তাহাদিগকে দুর্য্যোধনদিগের হস্তে অর্পণ করা হইল। তখন বনবাসের ব্যবস্থা হইল। এরূপ দেখিলে, আর কি হিন্দুশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া মনে হয়? যে হিন্দুর এমন শাস্ত্র, তাহার বনবাস কালে তাহার বল কত, তাহা অন্তে কি বুঝিবে? ঘোষ যাত্রায় যখন যাওয়া হইবে, তখন গন্ধর্ব্বের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উক্ত পাণ্ডবের আবশ্যকতা বুঝা যাইবে। পাণ্ডব উদ্‌যোগী হইয়া কুরুর সহিত অযথা ব্যবহার করে নাই। প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আত্মসংযম পূর্ব্বক তাপসবেশে বনে বনে কাটাইয়া—কিছুদিন অস্তিত্ব-হীনের ন্যায় অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া যথাসময়ে গোগৃহের হাঙ্গামায় আত্মপ্রকাশ এবং পরে আপনাদিগের দাবী করিয়াছিলেন।

এই সকল কথা মনে হইতে হইতে ধীরে ধীরে কাক-কোকিলের রবের সঙ্গে সেদিন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। আরও কত কথা মনে হইয়াছিল,—সে কথায় আর কাজ নাই।

বিরাট-ভবন।



আর একদিন বন্ধুবর্গের সহিত মহাভারত পাঠ করিয়া মনে হইল:—পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের রাজত্বকালে কাম্যবন, দ্বৈতবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া এবং শমীবৃক্ষে অস্ত্র রক্ষা করিয়া যে বিরাট-ভবনে প্রবেশ করিলেন, তাহা কোথায়? অর্থাৎ যে বিরাট-ভবনে সমগ্র ভারতবাসীর চরিত্র লুক্কায়িত থাকিতে পারে, তাহা কোথায়? এমন বিরাট-ভবন কি হইতে পারে? যদি না হয়, তবে হয় বলিতে হইবে যে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে পাণ্ডব চরিত্রই সমগ্র ভারতবাসীর চরিত্র বলিয়া মনে করা হইয়াছে, সে সংস্কার অমূলক, অথবা সেই পাণ্ডব চরিত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে, এরূপ বিরাট-ভবন অবশ্যই ছিল। আমার এইরূপ মনে হয় যে, ইহাই দুর্য্যোধনের রাজত্বকালে পাণ্ডবের জাতীয় সাধনার অবস্থা।—স্তরে স্তরে সাজান আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ-সেবিত জাতিভেদ প্রথার ভিতরে বসিয়া যে সাধনার অবস্থা, তাহাই সেই বিরাট-ভবনে বাস। এরূপ অবস্থাকে যে কেন বিরাট-ভবন বোধ হইয়াছিল, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে পাণ্ডবচরিত্র গুণ বা প্রকৃতি অনুসারে ধরা হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে নামের সৌসাদৃশ্য বা ব্যুৎপত্তির অর্থ (যদি সহজে পাওয়া গিয়া থাকে) তবে তাহাও গ্রহণ করা হইয়াছে। গুণ বা প্রকৃতি স্থায়ী পদার্থ।

সুতরাং সেই গুণ বা প্রকৃতি অনুসারে যাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে সহজে অমূলক ভাবিতে পারা যায় না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, "(১) বাঙ্গালীর ভাব চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত ধরিয়া যুধিষ্ঠির। * * * * (২) ভীমের ভীমত্বের সঙ্গে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীর মিল সহজেই অনুমিত হয়। *** (৩) পঞ্জাব হইতে মহারাষ্ট্রীয় দেশ পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিমস্থ যে ভূভাগে আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর স্থানের ন্যায় আর্য্যভাষা প্রচলিত, তথায় কি ধর্ম্মভাব, কি বীরত্ব, উভয়বিধ দৃষ্টান্ত বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। শিখ, রাজপুত এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাসই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তা'ই বলি, ইঁহাদের ভাব লইয়া অর্জ্জুন সৃষ্ট হইয়াছেন। *** এবং (৪) ও (৫) তামিল ও ত্রৈলঙ্গ-ভাষীদিগকে (মান্দ্রাজ বা) মদ্ররাজ তনয়ার পুত্রদ্বয় নকুল ও সহদেব ভাবিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বাঙ্গালীর সহিত যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া যেন এরূপ মনে না করা হয় যে, সমগ্র বাঙ্গালীজাতির ভিতর ভীমাদি অপর পাণ্ডব চতুষ্টয়ের, অথবা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীর ভিতর ভীম ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব চতুষ্টয়ের, অথবা পঞ্জাবাদি বাসীদিগের ভিতরে অর্জ্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডব চতুষ্টয়ের, অথবা দাক্ষিণাত্য বাসীদিগের ভিতরে নকুল ও সহদেব ব্যতীত অপর পাণ্ডবত্রয়ের, চরিত্র নাই,—একথা কখনই বলা যায় না। বরং গুণত্রয়ের একত্র সমাবেশেই প্রকৃতি, এবং প্রকৃতি হইতেই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির মধ্যেই—প্রত্যেক জাতি কেন, প্রত্যেক মানবেই গুণত্রয় বর্ত্তমান আছে

এবং তাহারই ন্যূনাধিক্যে বিভিন্ন চরিত্রের উপলব্ধি হয়। প্রত্যেক জীব বা প্রত্যেক জাতিতে গুণত্রয় আছে বলিয়াই, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেও কতক মিল পাওয়া যায়। তবে কাহাতে কোন্ গুণ অধিক, কাহাতে কোন্ গুণের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই বিশেষত্ব টুকু ধরা যায়। উদাহরণ দিয়া দেখিতে হইলে, ভীমে ও দুর্য্যোধনে অনেক সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েরই ক্রোধ, হিংসাদি রজোগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভীম সত্ত্বগুণ-প্রধান যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্ত্তী, এবং দুর্য্যোধন তমগুণাত্মক ধৃতরাষ্ট্রের অধীন—এই প্রভেদের জন্যই উহাদের বিভিন্নতা বুঝা যায়। মহাভারতকারও বোধ হয়, এইটী স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য শান্তিপর্ব্বে চার্ব্বাক রাক্ষস বধের পর পাণ্ডবদিগের নিম্নলিখিত প্রকার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন :—

"দুর্য্যোধন যেই গৃহে করিত বসতি।
ভীমসেনে সেই গৃহ দিলেন ভূপতি॥
যেই গৃহে বসতি করিত দুঃশাসন।
অর্জ্জুনেরে সেই গৃহ দিলেন রাজন্॥
দুর্ম্মর্ষণ যেই গৃহে করিত নিবাস।
নকুলেরে সেই গৃহ দিলা মহেশ্বাস॥
দুর্ম্মুখের গৃহখানি সহদেবে দিলা।
চারি ভাই মহাহর্ষে প্রবেশ করিলা॥"

(মহাভারত—রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদ।)

এইটী পাঠ করিয়া বোধ হয় যে, যেরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট, সে সেইরূপ গৃহ পাইল। তবে এক্ষণে এই সকল গৃহ নির্গুণতত্ত্বসেবী, সত্ত্বগুণাত্মক, ধর্ম্মরাজ্যভুক্ত, ইহাই পাণ্ডবের বিশিষ্টতা। আর একটী কথা বলিলে, আরও পরিষ্কার দেখা

যায়—গুণ অনুসারে ধরিতে গেলে, সত্ত্বগুণাত্মক ব্রাহ্মণ্য ভাব যুধিষ্ঠিরে অধিক। কর্ণপর্ব্বে কর্ণের উক্তিতে সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

"যুধিষ্ঠিরে কহে কর্ণ ওহে মহারাজ।
বুঝিয়াছি যুদ্ধ করা নহে তব কাজ॥
বেদ পাঠ যাগ যজ্ঞ কার্য্য যে তোমার।
যুদ্ধ না করিও রাজা সহিত আমার॥
এত কহি যুধিষ্ঠিরে করি পরিহার।
আরম্ভিলা শত্রুগণে করিতে সংহার॥"

(মহাভারত—রাজকৃষ্ণ বাবুর অনুবাদ।)

এইরূপে স্বর্গারোহণ বা মহাপ্রস্থান পর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, মহাভারতকার একপ্রকার স্পষ্টতঃই বলিয়া দিয়াছেন, যে, ভীমার্জ্জুন রজগুণ, এবং নকুল সহদেব তমগুণাত্মক পুরুষ; তবে, ইহারা সকলেই সত্ত্বগুণাত্মক যুধিষ্ঠিরের অধীন। একটী দেহের গঠন করিতে যেমন হস্ত পদাদি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সকলই আবশ্যক, জীবগঠনেও গুণত্রয়ের আবশ্যক। পাণ্ডব গঠন করিতে সেইটী স্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। কৃষ্ণা ইঁহাদিগের বন্ধনীশক্তি এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আত্মা।

যে যেরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার যে গুণ প্রধান, সে তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে সত্ত্বগুণাত্মক, সে সাত্ত্বিকভাবে, যে রজগুণাত্মক, সে রাজসিকভাবে এবং যে তমগুণাত্মক, সে তামসিকভাবে কার্য্য করিয়া থাকে,—এবং সেই অনুসারে করিলেই তাহার কার্য্য সহজ-সাধ্য হয়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, রজগুণই কার্য্যকরী শক্তি। উহা প্রায়ই সত্ত্ব অথবা তমগুণের অধীন হইয়া কার্য্য

করে। সত্ত্বগুণ আধ্যাত্মিক (Spiritual) বৈভবের জন্য এবং তমগুণ ভৌতিক (Material) বৈভবের জন্য লালায়িত। রজগুণ যখন যাহার অধীনে থাকে, তখন তাহার সাহায্য করে; এবং ইহারই প্রভাবে তৃতীয়গুণ নিষ্প্রভ থাকে; অর্থাৎ রজগুণ সত্ত্বগুণের অধীনে থাকিলে, তমগুণ নিষ্প্রভ আর রজগুণ তমগুণের অধীনে থাকিলে সত্ত্বগুণ নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সত্ত্বগুণাত্মক যুধিষ্ঠির যেমন পাণ্ডবদলের কর্ত্তা, তমগুণাত্মক ধৃতরাষ্ট্র সেইরূপ কুরুপক্ষের কর্ত্তা, অর্থাৎ সাধারণতঃ যে দুর্য্যোধনকে কুরুপক্ষের কর্ত্তা বলিয়া বোধ আছে, তাহা নহে। মহাভারতেও সেকথা উক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি শ্রাদ্ধের সময় শ্রবণীয় :—

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ
কর্ণঃ শকুনি স্তস্য শাখা
দুঃশাসন পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা
ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী।"

"যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো
ভীমসেনোঽস্য শাখা
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো
ব্রহ্ম ব্রাহ্মণাশ্চ।"

অর্থাৎ দুর্য্যোধন মন্যুময় বা পাপকারণ ক্রোধময় বৃক্ষস্বরূপ, কর্ণ ও শকুনি উহার শাখা, দুঃশাসন উহার পুষ্পফল স্বরূপ, এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ বৃক্ষের মূল। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় বৃক্ষস্বরূপ, অর্জ্জুন উহার স্কন্ধ, ভীমসেন উহার শাখাস্বরূপ, নকুল সহদেব উহার সমৃদ্ধ পুষ্পফল, এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ বর্গই ঐ বৃক্ষের মূল।

তবেই পাণ্ডবদলের কর্ত্তাও যুধিষ্ঠিরকে না বলিয়া পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেই ঠিক হয়। তাহা হইলেই অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও যে সয়তান এবং ভগবানের বিবাদের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই আসিয়া দাঁড়ায়। তবে ভগবান্ নির্গুণ বলিয়া উক্ত, এইজন্য সত্বগুণ-প্রধান যুধিষ্ঠিরকে বা ভগবানের তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে পাণ্ডবদলের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। কুরু পক্ষে তমগুণের প্রাধান্য বলিয়া ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সত্বগুণ-প্রধান মহাত্মাগণ পিতামহ, গুরু প্রভৃতি পদ পাইয়াও নিস্প্রভ। তাঁহারা কেবলমাত্র অন্ন-ভোক্তার ন্যায় অবস্থিত। তবে দুর্য্যোধনেরা তাঁহাদের যে মান্যটুকু করিত, তাহা নিজেদের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য বশতঃ—ভয়ে, ভক্তিতে বা কর্ত্তব্য বোধে নহে। কিন্তু ভীমার্জ্জুনাদির যে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, উহা ভয় বশতঃ নহে—কর্ত্তব্যবোধে। যুধিষ্ঠির যখন রাজা, তখনও ভীমার্জ্জুনাদি তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী; যখন কাম্যবনে পুরোহিতাদি অপর লোক সঙ্গে, তখনও উহারা আজ্ঞানুবর্ত্তী; আবার যখন চোরের ন্যায় গোপনবেশে অবস্থান, তখনও যুধিষ্ঠিরের কর্ত্তৃত্ব চলিতেছে। বিরাটভবনে এই শেষ অবস্থাটী দেখান হইয়াছে। আবার অপরপক্ষে—যিনি রাজাসনে আসীন, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অধিক, কি, তাঁহার পুত্রের কর্ত্তৃক অধিক, ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ধৃতরাষ্ট্র কতবার বলিতেছেন, ভীষ্ম দ্রোণ, যাহা বলেন, তাহাই হউক; কিন্তু কার্য্যতঃ দুর্য্যোধনের কথাই বজায় থাকে। যথায় তমগুণ প্রধান, তথায় রজগুণের কর্ত্তৃত্ব প্রতিহত। তথায় কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব খাটে না, বা তথায় সাম্যবাদ সংস্থাপিত। অপর পক্ষে যথায় সত্বগুণ প্রধান, তথায় সর্ব্বসময়েই কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকে; কিন্তু কোন্ বলে বা শক্তিতে যে সে কর্ত্তৃত্ব

বজায় থাকে, তাহা যুক্তিদ্বারা তমগুণাত্মকের অধীন রজগুণ-প্রিয় বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

যখন যুধিষ্ঠির রাজাসনে ছিলেন, তখন সকলে তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল, ইহা ত বেশ বুঝা যায়। কিন্তু যখন তিনি পথের কাঙ্গাল, তখন তাঁহাকে মান্য করাই সাধারণতঃ বিচিত্র কথা। অস্মদ্দেশের জাতিভেদ প্রথায় এইটী দেখিতে পাওয়া যায়। তা'ই বলি, বিরাটভবন সেই জাতিভেদ প্রথা, এবং তথায় লুকাইলে তমগুণের অধীন রজগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি আর প্রকৃত ব্যাপার দেখিতে পায়েন না।

এখন দেখা যাউক, বিরাট-ভবনে কোন্ পাণ্ডব কিরূপে লুক্কায়িত ছিলেন। যুধিষ্ঠির রাজার সভাসদ, ভীম মল্ল কার্য্যে এবং রন্ধন শালায় নিযুক্ত, অর্জ্জুন নপুংসকবেশে রাজকন্যাগণের শিক্ষয়িত্রী, নকুল অশ্বপাল, সহদেব গোপাল বা পশুপাল এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী হইয়াছিলেন।

পাণ্ডবের এরূপভাবে থাকার উদ্দেশ্য কি? নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-পাশ হইতে মুক্ত হওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহ সংসারে সকলেরই সেই দশা। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু গুণত্রয়ের মর্ম্ম ও কর্ম্মের প্রভাব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, এবং নির্গুণ তত্ত্বই জীবের চরম জানিয়াই সত্ত্বগুণ-প্রধান জাতিভেদ ব্যবস্থা দ্বারাই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রকে সাজাইয়াছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের মাহাত্ম্য না বুঝিলে সত্ত্বগুণের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যায় না। আপাত-মধুর তমগুণের প্রশ্রয়-দাতা বাহ্যিক সাম্যবাদ এই অকৃত্রিম জাতিভেদের মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম নহে। বাহির হইতে ইহা অদ্ভুত বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এইরূপে জাতিভেদ প্রথা পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই মনে হয়, পাণ্ডব চরিত্র বা হিন্দুর চরিত্র

জাতিভেদ প্রথারূপ বিরাট-ভবনে লুক্কায়িত ছিল, এবং পাণ্ডবপক্ষীয় যাহারা জাতিভেদ প্রথাকে অবজ্ঞা করিয়া সকলের "সম অধিকার" বোধ করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিজিত প্রজা বা কুরুপক্ষীয়গণের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে, ইহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল।

আর একটী কথা—তমগুণের রাজ্যে পার্থিব বৈভব অনুসারে অধিকার নির্ণয় হয়, আর সত্বগুণের রাজ্যে অধ্যাত্ম বল অনুসারে অধিকার নির্ণয় হয়। এই অধ্যাত্ম বলটী কি, তাহা তমগুণের অধীনে বুঝা যায় না। তা'ই মোট কথায় তমগুণের রাজ্যে ধনবত্তা দেখিয়া এবং সত্বগুণের রাজ্যে সৎপ্রবৃত্তি দেখিয়া ভদ্রাভদ্র বিচার হয়। কিন্তু সৎপ্রবৃত্তি দৃঢ়রূপ বুঝিবার ক্ষমতা তমগুণের নাই, এই জন্যই দুর্য্যোধন ধন, জন, মান বৃদ্ধির দিকেই প্রশ্রয় দিতেন। সত্য, দান, তপ এ সকলের মাহাত্ম্য দুর্য্যোধনের রাজ্যে বর্ণিত হয় নাই, উহা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যেই শুনা যায়।

এইরূপে গুণকর্ম্মের লক্ষণ দেখিয়া এবং পঞ্চ পাণ্ডবের আন্তরিক একতা দেখিয়া মনে হয় যে, যদি আত্মার একত্ব এবং গুণের বৈষম্য স্বীকার করিয়া এবং অহঙ্কার ভাব ত্যাগ করিয়া চলা যায়, তাহা হইলে নিজ অধিকার অনুসারে পাণ্ডবের ন্যায় কেহ রাজসভায়, কেহ রন্ধনশালায়, কেহ নৃত্যশালায়, কেহ গোশালায়, কেহ বা অশ্বশালায় থাকিয়া, এবং কেহ লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়াও সৈরিন্ধ্রীবেশে কর্ম্মক্ষয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পাণ্ডবগণ মোহাদি রিপুগণে অভিভূত ছিলেন না বলিয়া, কর্ত্তব্যবোধে জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার, জ্যেষ্ঠের ত্রুটীতেও দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার, এবং নিজ নিজ

অধিকার নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত বলিলে বিরাট-ভবন একপ্রকার বুঝিতে পারা গেল বটে; কিন্তু বহুদিন হইতে এই জাতিভেদ প্রথা অস্মদ্দেশ হইতে উঠাইবার চেষ্টায় ইহা এমন বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, এখন ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়া উঠা কঠিন, এবং সেইজন্য আরও দুই চারি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

(১) যদি জাতিভেদ স্বাভাবিক গুণের উপর নির্ভর করিয়া হইয়াছে, তবে উঠাইবার চেষ্টা কেন?

(২) এই বিরাট-ভবন যদি জাতিভেদ প্রথা হইল, তবে কীচক-বধাদি প্রকাণ্ড ঘটনাগুলি কি?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, রজগুণের দ্বারা চালিত হইয়া স্বভাবকে বিকৃত করা জীবের একটী লক্ষণ এবং নীচ বা ছোট যদি শুনিতে পায় যে, সে বড়র সমান, তবে আনন্দে আটখানা হয়, এবং যাহার মুখে ওকথা শুনে, তাহাকেও বড় বলে, এবং নিজেও অহঙ্কার কর্ত্তৃক চালিত হইয়া উহাকেই প্রকৃত তথ্য মনে করে। তবে সাধু ব্যক্তিরা যখন আত্মার একত্ব বুঝেন, যখন জড় গুণকে উপেক্ষা করিতে পারেন, যখন অগ্নির উত্তাপ এবং বরফের শৈত্য সমান বোধ করেন, তখন আত্মার একত্ব উপলব্ধি করিয়া সব সমান বলেন, কিন্তু তাঁহারা সেকথা জন-সাধারণের জন্য প্রচার করিয়া বেড়ান না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া দেখা যায়, পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস কালে বিরাটভবনে প্রধানতঃ চারিটী ঘটনা ঘটিয়াছিল;—(১) ভীমের মল্লযুদ্ধ (২) কীচক-বধ (৩) গোধন হরণ (৪) পাণ্ডব প্রকাশ ও অভিমন্যুর বিবাহ। এই চারিটী ঘটনার বিষয় যদি সকলদিক্ ধরিয়া বলা যায়,

তাহা হইলে এ প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়ে; আর পাঠকেরাও একটু চর্ব্বণ করিয়া এ রস আস্বাদ করেন, ইহাও প্রার্থনীয়। তবে এস্থলে সামাজিক ও জাতিভেদ প্রথা উপলক্ষে কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে, অন্যান্য বিষয় আবশ্যক-মত পরে ধরা যাইতে পারে।

(১) ভীমের মল্লযুদ্ধ—এতৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই পর্ব্বাধ্যায়ে মহাভারতকার দেখাইয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ (ওরফে ভারতবাসী) অজ্ঞাত-বাসকালে বিরাট-ভবনে নিজ নিজ স্থান অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কিরূপ পালন করিতেছেন।

(২) কীচক-বধ—জাতিভেদ-প্রথা-বিদ্বেষীরা বলেন, জাতিভেদ অহঙ্কার-বৃদ্ধিকর। অবশ্য উচ্চ জাতির বিরুদ্ধেই সে কথা বলা হয়। অহঙ্কার মোহের জন্মদাতা। মোহ অজ্ঞানতা-বর্দ্ধক। প্রকৃত-পক্ষেই যে স্থলে সত্ত্বগুণাত্মকের শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তথায় জাতিভেদ কেবল অহঙ্কার-বৃদ্ধি-কর কেন, অনেক প্রকার দোষাবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতি-ভেদ যখন গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে হইয়া থাকে, তখন যেখানে গুণকর্ম্ম থাকিবে, সেইখানেই জাতিভেদ থাকিবে; এবং সেই জন্যই জাতিভেদ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তবে যথায় আধ্যাত্মিক বলের প্রাধান্য নাই, তথায় অঙ্গের বল বা ধন-বল প্রাধান্য পাইয়া সমাজের শীর্ষস্থান গ্রহণ করে। সেই-রূপে মৎস্যরাজ্যে কীচক ধীরে ধীরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিল। কীচকের পরিচয়ে দেখা যায় যে, সে সুশর্ম্মাকে পরাজয় করিয়াছিল, এবং বিরাটরাজ্যের প্রকৃত রাজা না হইয়াও রাজার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা পাইয়াছিল—রাজা ন্যায় ধর্ম্ম অপেক্ষা কীচককে অধিক ভয় করিতেন। এ হেন কীচক

সাধনা রাজ্যে মূর্ত্তিমান কামাদি রিপুস্বরূপ। জানি না, এই কীচকের মাৎসর্য্য দেখিয়া বিরাট-ভবনের অপর নাম মৎস্ত রাজ্য হইয়াছে, কি না? যাহা হউক, যখন সেই কীচক রাজলক্ষ্মী স্বরূপিণী, সত্ত্বরজস্তমগুণের বন্ধনী স্বরূপিণী, প্রেম-ভক্তি স্বরূপিণী দ্রৌপদীকে আক্রমণ করিল, তখন গুণত্রয় কাঁপিয়া উঠিল। সত্ত্বগুণের ইঙ্গিতে রজোগুণ তাহাকে ধ্বংশ করিল। ধ্বংশ করিবার ধরণটী দেখিলে, রিপু সংযত করিয়া ধ্বংশ করাই যে শাস্ত্রের বিধি, তাহা মনে পড়ে। ভীম কীচকের হস্তপদাদি সংযত করিয়া দিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। বিরাট-ভবনে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস কালে কীচক-বধ ব্যাপারটী সামাজিকভাবে দেখা যাউক। জাতি-ভেদ প্রথার মধ্যে স্বার্থপর, কামুক, লোভী ইত্যাদি রিপু-পরতন্ত্র লোকের ভাব লইয়া কীচক গঠিত। এরূপ লোকও কখন কখন সমাজ মধ্যে প্রশ্রয় পায়। এবং ঐরূপ লোক প্রশ্রয় পাইলে সে কখন বৃথা ভক্তিগর্ব্বে, কখন বৃথা জ্ঞান গর্ব্বে, কখন ধনগর্ব্বে ইত্যাদি রূপে মাৎসর্য্য পরতন্ত্র হইয়া এরূপ ব্যবহারিক কার্য্যকলাপে চলিয়া থাকেন যে, হঠাৎ লোকের সন্দেহ হয়, যেন সেই লোক দ্বারা সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে। গর্ব্বে ধর্ম্মরক্ষিত হয় না। যতদিন সেই লোককে ভক্তি, জ্ঞান বা ধনের আশ্রয় বলিয়া সাধারণের তাহার প্রতি বিশ্বাস থাকে, ততদিন ভক্তি, জ্ঞান বা ধনের কাঙ্গাল জনসাধারণ তাহার সেবা করে। স্বার্থ বুঝিয়া চলিলে, ধন ওরূপ অবস্থায় টিকিতে পারে; কিন্তু সাত্ত্বিকী ভক্তি বা জ্ঞান ওরূপ স্থলে থাকেন না। এইজন্যই ওরূপ লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব লোপ পাইয়া লৌকিকভাবে পরিণত হয়। ধনের আদান প্রদান যেমন

সহজ, জ্ঞান-ভক্তির আদান প্রদান, তেমন সহজ সাধ্য বা বোধ্য নয়। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অন্ধত্ব-ব্যঞ্জক তমঃগুণাত্মকেরা ধন, বল, ধনাধিকার যেমন বুঝেন, জ্ঞান-ভক্তির বল তেমন বুঝেন না। যখন কীচকের ন্যায় লোকের অধীনে সমাজ পাপ প্রাপ্ত হয়, তখন সরলচিত্ত লোক সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করিয়া থাকেন। "সুশর্ম্মা" * সেইজন্য বোধ হয়, বিরাট-ভবনের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কার কার্য্য কঠিন ব্যাপার। দেশ কাল পাত্রের সংযোগ চাই। শুদ্ধ ইচ্ছা মাত্রেই যে সে লোকের দ্বারা রাতারাতি সংস্কার হয় না। কাযেই সহজেই কীচকের দ্বারা নিবারিত হইলেন। পরে যেরূপেই হউক, কীচক নিধন হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া সুশর্ম্মা কুরুরাজের সাহায্যে বিরাট-ভবনে প্রবেশ করিয়া গোধন হরণের চেষ্টা করেন। গোধনই বিরাট-ভবনের প্রধান সম্পত্তি। সাধক-সংসারীর গোধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্পত্তি, আর কি হইতে পারে? এহেন ধন যখন দুর্য্যোধন আক্রমণ করিল, তখন ধর্ম্ম-স্বরূপ গোধন রক্ষা করিতে যেরূপ কার্য্য করা উচিত, সাধক ভারতবাসী তাহাই করিয়াছিলেন। নাম প্রকাশ বা যশ প্রার্থনা ত সাধকের পক্ষে কোন সময়েই উচিত নয়, সেজন্যই এ অবস্থাকে অজ্ঞাত অবস্থা বলা হইয়াছে। সাধক কর্ত্তব্যবোধে কার্য্য করেন,—সুখের বা যশের প্রার্থী নহেন।

(৩) গোধন হরণ—কীচক-বধ হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া ধৃতরাষ্ট্র রাজার সাহায্যে সুশর্ম্মা গোধনহরণে উদ্যত হইয়া বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিয়া মৎস্যরাজকে পরাস্ত

* so-called reformer.

করেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে ভীম অজ্ঞাত ভাবে মৎস্য-রাজ এবং সুশর্ম্মার শীর্ষদেশ (জ্ঞান বুদ্ধির স্থান) সজোরে ধরিয়া ধর্ম্মের পদানত করাইয়া দেন। প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিত ধর্ম্মরাজ তখন সুশর্ম্মাকে ছাড়িয়া দেন। সুশর্ম্মা সবলচিত্ত হইলেও, কুরুভাবাপন্ন হইয়া ধর্ম্মরাজকে চিনিতে পারেন নাই।

আবার অর্জ্জুন "শমী" * বৃক্ষ হইতে অস্ত্র লইয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়গণকে মুগ্ধ করিয়া গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন। গোধন রক্ষা না হইলে, সাত্ত্বিক ভাব নষ্ট হয়, আচার ভ্রষ্ট হইতে হয়। সত্ত্বগুণ-প্রধান লোক জানেন যে, আচারই ধর্ম্মের মূল। পাণ্ডব যে এহেন গোধন রক্ষায় তৎপর হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? এস্থলে আর একটী কথা বলি,—অর্জ্জুন গোধন-রক্ষার্থে কুরুসৈন্যের নিকটবর্ত্তী হইলে কুরুপক্ষীয় সাত্ত্বিকগুণপ্রধান ভীষ্ম দ্রোণই তাহাকে প্রথমে চিনিয়াছিলেন। প্রকাশ বা জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টিই সাত্ত্বিকগুণের লক্ষণ।

(৪) পাণ্ডবপ্রকাশ ও অভিমন্যুর বিবাহ—কুরুপক্ষীয় ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিলেও, যথাসময়ে পাণ্ডব ইচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশিত হইলেন, এবং বিরাটের সিংহাসনেই বসিলেন। সাধনার অবস্থাতেও এইরূপ স্তরে স্তরে সাজান—জন্মে-জন্মে-ক্রমোন্নতির-পথ-বিমুক্ত জাতিভেদ প্রথার অধীনে দীনভাবে থাকিয়া পাণ্ডব যথাসময়ে প্রকাশিত হইলেন। কোন মহাত্মা লিখিয়াছেন, "হিন্দুর জীবন বিরাটজীবন, উহা এক জন্মে শেষ হয় না। যিনি এই কথাটার উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে গুণ

* শমদমাদি।

কর্ম্মানুসারে সাজান জাতিভেদ প্রথা আর বিষম বোধ হইবে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যদি অজ্ঞাতবাসের জন্যই জাতিভেদ প্রথার আবশ্যক হয়, তবে পাণ্ডব প্রকাশের পর উহা থাকিল কেন? প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডব প্রকাশ হইলে মৎস্যরাজ্য আর পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ রহিল না, কিন্তু বিবাহাদি কার্য্যে জাতিভেদ প্রথার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

যে দেশে জাতিভেদ প্রথা স্বীকৃত হয় না, সে দেশে জনসাধারণের মধ্যে বৈবাহিক কার্য্যে বিশেষ বিচার দেখা যায় না বটে; কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে ভদ্রতা, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, ধনবত্তা ইত্যাদি আছে, তাঁহারা উচ্চ বংশাদির মর্য্যাদা স্বীকার করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে এই মর্য্যাদা সামান্য লোকেও বুঝিয়া থাকেন। জাতিভেদ প্রথা কেবল পদস্থ ধনীগণের ভোগবিলাসের জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই, উহা সকলকে যথাযোগ্য স্থান দিয়া জন্মে জন্মে ক্রমোন্নতির পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহার শীর্ষস্থানীয়গণ ভোগ-বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া (কীচক-বধ পূর্ব্বক) বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্যবোধে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

সংক্ষেপে বিরাট-ভবনের কথা বলা হইল। এস্থলে অভিমন্যু প্রভৃতির কথা তুলিলে, অন্য কথা আসিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে, সেই ভয়ে আপাততঃ বন্ধ করা গেল।

পরিশিষ্ট।



শ্রীচৈতন্যলীলা—নিত্যলীলা।

যে কয়টী প্রবন্ধ দিয়া পুরাণ-রহস্য প্রথম ভাগ শেষ হইল, ইহা পাঠ করিয়া কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন, 'যদি যুধিষ্ঠিরকে বাঙ্গালী জাতি বা সাত্ত্বিক গুণবিশিষ্ট জাতি মনে করা যায়, তবে কি যুধিষ্ঠির ছিলেন না? যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি ছিলেন না, জন-সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ত ভাঙ্গিতে যাওয়া ভাল নয়।' বন্ধুবরের এই কথাটী শুনিয়া মনে হইল, বোধ হয়, লেখার কোন ত্রুটী হইয়াছে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ছিলেন না, এমন কথা ত বলি নাই। বরং ঐরূপ গুণবিশিষ্ট এক একজন ছিলেন, এবং তাঁহাদের ভাব লইয়া এক একটী জাতি হইয়াছে—ইহাই বলিয়াছি। পাছে এরূপ বিষমবোধ অন্য কোন পাঠকের হয়, এইজন্য এই কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত ঐতিহাসিক কালের বা ইদানীন্তনকালের একটী কাণ্ড বা লীলা উপলক্ষ করিয়া দুই একটী কথা বলি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধীয় কথা যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, উহাঁর আবির্ভাবের অল্পদিন পূর্ব্বে স্বার্থপর, বিষয়ী, বৃথা-আমোদ-প্রিয় লোকের দল বৃদ্ধি হইলে লোকহিতৈষী ভগবদ্ভক্ত শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈত প্রভু জীবের দশা মলিন দেখিয়া বড় ব্যাকুল হয়েন, এবং জীবের মঙ্গলার্থ স্বয়ং ভগবান্ আসিয়া যাহাতে লোক

উদ্ধার করেন, সেজন্য প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনার ফলে, সেই ৮ গঙ্গাজল তুলসী দিয়া আবাহনের ফলে, নবদ্বীপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হয়েন। এবং লোককে জ্ঞান বৈরাগ্য শিক্ষাদিবার জন্য বলেন :—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি॥"

উক্তরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে যে প্রেমভক্তি লাভ হয়, এই মহাজ্ঞান শিক্ষা দিয়া জগৎ মাতাইয়াছিলেন। তিনি (ব্রহ্ম) জ্ঞান, (আন্তরিক) প্রেম এবং (সবৈরাগ্য) কর্ম্ম যে একাধারে আবশ্যক, তাহা তাঁহার ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীসার্ব্বভৌম প্রভৃতি কয়েকজন জ্ঞানী ভক্তকে দেখাইয়াছিলেন। এ আধিদৈব মূর্ত্তি জনসাধারণ দেখিতে পায় নাই। যাহা হউক, এসকল ঘটনা ঐতিহাসিক সময়ে ঘটিয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত কড়চা, সে সময়ের ঘটকদিগের পুঁথি,

---

* অমানিত্ব মদম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তি রনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়িচানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

গীতা ১৩শ অঃ ৭-১১।

প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান, এবং সহ লীলাকারী প্রভুগণের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের উজ্জ্বল মণিস্বরূপ শোভা পাইতেছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার এ সকল জাজ্বল্যমান প্রমাণ থাকিলেও, যাঁহারা ভগবান্‌কে ধ্যানগম্য ভাবময় মূর্ত্তিতে দেখিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, ইহ-জগতে হিন্দু অদ্বৈতবাদী এবং শান্তিপ্রিয়। অতএব যেন জীবের দশা মলিন দেখিয়া অর্থাৎ ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত মানব মণ্ডলীকে দেখিয়া হিন্দু (অর্থাৎ শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈত) ভগবান্‌কে ব্যাকুলভাবে ডাকায়, নবদ্বীপে অর্থাৎ নূতন জ্যোতিতে "বিশ্বরূপ" অনুজ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ ভাবিলে, সঠিকবাদী (Positivist) বা আধিভৌতিক (Material) ভাবের প্রিয় জনগণের মতে দোষ হইতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি, যে, আধিদৈবিক ভাবদর্শী কবিগণের মতে অথবা অধ্যাত্মদর্শী মহাপুরুষগণের মতে ইহাতে দোষ পড়ে না। তাঁহারা নিত্যলীলা অর্থাৎ গুণত্রয়ের ও পরমাত্মার লীলা যে নিত্য,—উহা ঘটনা-বিশেষ বা ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ নহে, এই কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু গুণকর্ম্মানুসারে চিত্ত-ভেদ হইয়া থাকে, এইজন্য একই ঘটনা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তা'ই বলি, ভগবদ্ভাবগতচিত্ত নিত্য দর্শনা-কাঙ্ক্ষীগণ "বিশ্বরূপ" বা "বিশ্বরূপানুজ ষড়্‌ভুজ' দর্শন করিতে চাহেন, একথা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? আমার একজন মাননীয় বন্ধু বলেন, মোটা কথায়, তোমার পুত্র তোমায় পিতা দেখেন, তোমার পত্নী তোমাতে পতি দেখেন, তোমার বন্ধু তোমায় বন্ধু দেখেন, তোমার ভাই তোমায় ভাই দেখেন, তোমার চাকর তোমায় মনিব দেখে, ইত্যাদি

যখন তোমার ন্যায় সামান্য একই পদার্থতে এতরূপ দেখা যায়, তখন সেই অচিন্ত্য সর্ব্বেশ্বরকে যে অনন্তরূপে দেখা যায়, ইহা আর বিচিত্র কি? কবি রামেশ্বর বলেন;—

"জগতে ভকত ধন্য, যাহার পালন জন্য,
একমূর্ত্তি অনন্ত রূপিণী।"

যিনি যে মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি সেই মূর্ত্তিই দেখেন। তিনি শান্তদর্শীর নিকট সৌম্য, দাস্য ভাবদর্শীর নিকট প্রভু, সখা, ভাবদর্শীর নিকট সখা, বাৎসল্য ভাবদর্শীর নিকট পুত্র, মধুর ভাবদর্শীর নিকট রসরাজ। তবে সাত্ত্বিকগুণের অধীন স্বদেশসেবীর বা স্বসমাজসেবীর নিকট তিনি পরপীড়া-বিহীন স্বজাতিবাৎসল্য মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন না কেন?

অনেকের বোধ আছে, পর জাতি পীড়ন না করিলে, স্বজাতি-বাৎসল্যের মূর্ত্তি দেখা যায় না। একথা অন্ধত্বব্যঞ্জক তমগুণের কথা। নিজের ছেলেটীকে ভাল বাসিলে, পরের ছেলেটীর দ্বেষ করিতে হইবে, নিজের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলে, পরধর্ম্মের দ্বেষ করিতে হইবে, একথা সাত্ত্বিকগুণ-প্রধান লোকের নিকট কখনও শুনি নাই। তাই বলি, সাত্ত্বিকগুণের অধীন স্বদেশসেবীর নিকট তিনি পরজাতি দ্বেষবিহীন স্বজাতিবাৎসল্য মূর্ত্তিতে কেন দেখা দিবেন না? ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন:—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।"

এবার এই পর্য্যন্ত।——

সমাপ্ত।

